وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ই'তিছাম

الاعتصام

উছমান ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যুদ্ধের মাঠে ঢাল যেমন তোমাদের রক্ষা করে, ছিয়ামও তদ্রূপ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢাল' (ইবনু মাজাহ, হা/১৬৩৯)।

• ৬ষ্ঠ বর্ষ • ৬ষ্ঠ সংখ্যা • এপ্রিল ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:٦، شعبان و رمضان ١٤٤٣ ﻫ / أبريل ٢٠٢٢م العدد: ٦، الجزء: ٦٦
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মাইনর মসজিদ, তাসখন্দ, উজবেকিস্তান : রাজধানী শহর তাসখন্দের আখর নদীর তীরে উজবেক স্থাপত্যশৈলিতে ২০১৪ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়। মূল ছালাতের স্থানটি দ্বিতলবিশিষ্ট। দুই পাশে ৩৮ মিটার উঁচু দুটি মিনার রয়েছে। ২৪০০ মুছল্লী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদটির অভ্যন্তরভাগ বিভিন্ন নকশা, কুরআনের আয়াত ইত্যাদি ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সজ্জিত। সাদা মার্বেল পাথরে মোড়া মসজিদটির গম্বুজগুলো নীল আকাশের সাথে মিশে একটি চমৎকার দৃশ্য তৈরি করে।

BONOJO

TM
Organic BONOJO
bonojobd.com
01704550806
/bonojobd
সুন্দরবনের
খলিশা ফুলের মধু
দেবহাটা, সাতক্ষীরা
অর্ডার করতে ফেসবুক পেজে ম্যাসেজ দিন
bonojobd
চাষের নয়, প্রাকৃতিক মধু

সদ্য প্রকাশিত দুটি বই

সলাতে মাসবূকের বিধি-বিধান
আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
সম্পাদনায় : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
মূল্য : ১৫ টাকা | পৃষ্ঠা : ২৪

আহলেহাদীছদের উপর
মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব
আকতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান
সম্পাদনায় : শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
মূল্য : ৫০ টাকা | পৃষ্ঠা : ৮০

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সালাফ 01407-021847 আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

৬ষ্ঠ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

এপ্রিল-২০২২
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৮-২৯
শা'বান-রামাযান
১৪৪৩

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক,
  আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
  তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
  ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
  ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
  ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
  বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
  বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২০০/-	৪০০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় — ০২

◈ প্রবন্ধ

» হজ্জ ও উমরা (শেষ পর্ব) — ০৩
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাশিক্ষার বৈষম্য (পূর্ব প্রকাশিতের পর) — ০৫
-ড. মো. কামরুজ্জামান

» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-৫ম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-১২তম পর্ব) — ০৭
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» হক্বের মানদণ্ড (পর্ব-৪) — ১০
-মূল (উর্দু) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইলম গোপন রাখার হাদীছের ব্যাখ্যা — ১৩
-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

» রামাযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত — ১৫
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন

» নারীদের ছিয়ামের বিধান — ১৮
-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন

» যাকাত বের করার সঠিক পদ্ধতি — ২০
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» ই'তিকাফের গুরুত্ব ও ফযীলত — ২৫
-আব্দুল হামীদ বিন মুজিবুর রহমান

» লায়লাতুল ক্বদরের বিধান — ২৭
-সাজ্জাদ সালাদীন

» কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান (পর্ব-৩) — ৩০
-মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে

» উত্তম ও সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদন করা সাফল্য ও সন্তুষ্টির পথ — ৩২
-অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী

◈ দিশারী

» সময় তো ফুরিয়ে এলো, নববর্ষ ও পহেলা বৈশাখে কেন আনন্দ কর? — ৩৪
-জাবির হোসেন

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা

» গ্রন্থ পরিচিতি-১৩ : সুনানে ইবনু মাজাহ — ৩৮
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ কবিতা — ৪০

◈ সংবাদ — ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব — ৪৩

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য নিষিদ্ধের ইসলামী আইন বলবৎ রাখুন

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে কার্যকর হওয়া মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত নতুন বিধিমালা দেখে রীতিমতো হতভম্ব হয়েছি। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষাসেবা বিভাগ থেকে 'অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২' জারি করা হয়েছে। 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮' এর আওতায় বিধিমালাটি করা হয়েছে। বিধিমালা মতে, 'মদ কেনাবেচা, পান, পরিবহনের ক্ষেত্রে লাইসেন্স, পারমিট ও পাস নিতে হবে। কোথাও কমপক্ষে ১০০ জন মদের পারমিটধারী থাকলে ওই এলাকায় অ্যালকোহল বিক্রির লাইসেন্স দেওয়া হবে। আর ২০০ জন হলে দেওয়া হবে বারের লাইসেন্স। ২১ বছরের কম বয়সের ব্যক্তি মদপানের অনুমতি পাবেন না। মদপানের অনুমতি আছে এমন ব্যক্তিরা এখন থেকে হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং দুই তারকা হোটেল থেকে শুরু করে ক্লাব, পর্যটনকেন্দ্র, অ্যামিউজমেন্ট পার্কে মদ কিনে পান করতে পারবেন'।

ইন্না-লিল্লাহ! কীভাবে একটি মুসলিমদেশে মদ উৎপাদন-প্রক্রিয়াজাতকরণ, মদপান, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রফতানি, বিপণন, সরবরাহ ইত্যাদির অনুমতি মিলতে পারে! মদের এ অনুমোদন আমাদের রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে অবশ্যই অবশ্যই এমন কিছু মানুষের সৃষ্টি হবে, যারা যেনা, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল করে নিবে' *(বুখারী, হা/৫৫৯০)*। আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে চাই, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন নয়; বরং মাদকদ্রব্য বন্ধের ইসলামী আইন প্রয়োগ করুন। মদসহ যে কোনো নেশাদার দ্রব্য বন্ধের নতুন কোনো আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের কোনোই দরকার নেই। বরং এক্ষেত্রে ইসলামী আইনই যথেষ্ট। ইসলামী আইনে সর্বপ্রকার নেশাদার দ্রব্য হারাম *(বুখারী, হা/৪৩৪৩; মুসলিম, হা/১৭৩৩)*। কারণ নেশাদার দ্রব্য সকল কু-কর্মের চাবি *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭১)*, সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল *(নাসাঈ, হা/৫৬৬৭)*। ইসলামী আইনে নেশাদার দ্রব্য সম্পর্কিত দু'টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে, (১) যার বেশি পরিমাণ গ্রহণে নেশা আসে, তার অল্পও হারাম *(সুনানে আরবা'আহ)*। (২) নেশাদার দ্রব্য যে নামেই চলুক কেন, তা হারাম *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৮৫)*। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ছলচাতুরির আশ্রয় নেওয়ার দুঃসাহস যেন কেউ না দেখায়। পবিত্র কুরআন মদকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাপাক ও শয়তানের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে আর শয়তান যে এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ায় এবং আল্লাহর যিকির ও ছালাত থেকে মানুষকে বাধাগ্রস্ত করে, তাও স্পষ্ট বলেছে *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)*। মদপানের অপরাধে এই উম্মতের জন্য ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের আযাব অপেক্ষমান *(তিরমিযী, হা/২২১২)*। মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিশাপ করা হয়েছে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চূড়ান্ত ঘোষণা, 'আল্লাহর অভিশাপ মদের উপর, পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, প্রস্তুতকারী, প্রস্তুতের নির্দেশদাতা, বহনকারী ও যার উদ্দেশ্যে বহন করা হয়, তার উপর' *(আবু দাঊদ, হা/৩৬৭৪)*। মদের যাবতীয় ব্যবসা এবং এপথে উপার্জিত সমুদয় অর্থ হারাম *(বুখারী, হা/২২২৬; আবু দাঊদ, হা/৩৪৮৫)*। আর হারাম অর্থ ভোগকারীর ইবাদত কবুল হবে না *(মুসলিম, হা/১০১৫)*। মদপানকারীর ৪০ দিন ছালাত কবুল হয় না *(নাসাঈ, হা/৫৬৬৪)*। মদপানকারী মূর্তিপূজকের ন্যায় *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৭৫)*। মদপানকারীর জন্য জান্নাত হারাম *(আহমাদ, হা/৫৩৭২)*। মদপানকারীকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের ঘাম, রক্ত, পুঁজ পান করানো হবে *(মুসলিম, হা/২০০২)*।

এছাড়া ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতিসহ নেশাদার দ্রব্যের রয়েছে আরো অনেক ক্ষতি। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নিরাপত্তাগত কোন্ ক্ষতি নেই নেশাদার দ্রব্যে? নেশাখোর শারীরিক ও মানসিকভাবে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে। প্রতি বছর নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ করার কারণে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশ ও জনগণ। নেশাদার দ্রব্য গ্রহণ করার কারণে মারামারি, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন ইত্যাদি আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যায়। ফলে মারাত্মকভাবে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এর মাধ্যমে একটি অসুস্থ, মাতাল ও বেকার প্রজন্ম তৈরি হয়।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদপানকারীকে লাঠিপেটা ও জুতাপেটা করতেন *(মুসলিম, হা/১৭০৬)*। মদপানকারীকে ৮০ বেত্রাঘাত করতে হবে *(ঐ)*। অতএব, আমরা সরকারকে বলব, খবরদার! কুরআন-হাদীছের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন না। নেশাদার দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন নয়; বরং যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য নিষিদ্ধ করুন। এর সাথে জড়িতদের শক্তহস্তে দমন করুন। তাহলে দেশ-জাতি সুখে থাকবে। ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলময় হবে। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(শেষ পর্ব)

১১, ১২ ও ১৩ তারিখে পাথর মারার সময় : ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিটি জামরায় ৭টি করে মোট ২১টি পাথর মারতে হবে। এ দিনগুলোতে **পাথর মারার সময় হলো সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে মাগরিব পর্যন্ত। সূর্য ঢলার পূর্বে পাথর মারলে তাকে পুনরায় পাথর** মারতে হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে রাতে পাথর মারতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাখালরা রাতে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং দিনে পশু-প্রাণী চরাবে।[১] এই হাদীছ প্রমাণ করে, জরুরী প্রয়োজনে রাতে পাথর মারা যাবে।

রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর পাথর মারার নিয়ম : যুহরী হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পাথর মারতেন, মিনার মসজিদের দিক হতে মারতেন। আর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখনই পাথর মারতেন, সাতটি পাথর মারতেন এবং প্রত্যেকটি পাথর মারার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করতেন এবং এ স্থানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি পাথর মারতেন এবং প্রতিটি পাথর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর বাম দিকে সরে ওয়াদীর নিকটবর্তী হতেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে দু'আ করতেন। অতঃপর আকাবার পাশে এসে বড় জামরায় সাতটি পাথর মারতেন এবং প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর বলতেন। তারপর ফিরে যেতেন। এখানে দেরি করতেন না।[২]

পাথর মারতে অক্ষম হলে অন্যরা তার পাথর মারতে পারে। ১২ বা ১৩ তারিখে পাথর মারা হলে মিনার কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর মক্কায় চলে আসতে হবে।

১. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৪৭৭।
২. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৫৩।

যা করা যাবে না :

(১) ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে সূর্য ঢলার আগে পাথর মারা।

(২) একবারেই সাতটি পাথর মারা।

কিছু কথা :

কারণবশত মিনার দিনগুলো মক্কায় কাটানো যায়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) বলেন, আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন এ মর্মে যে, তিনি হাজীদের পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতগুলো মক্কায় কাটাবেন। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩] আবুল বাদ্দাহ ইবনু আছিম ইবনু আদী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'উটের রাখালদের মিনায় রাত্রিযাপন করার দরকার নেই। তাদের আরো বলেছিলেন, তারা ঠিকমতো পাথর মারবে এবং দুই দিনের পাথর জমা করে এক দিনে মারবে'।[৪] এই হাদীছে বুঝা যায়, কারণবশত দুই দিনের পাথর এক দিনে মারতে পারে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রাখালদের বলেছিলেন, 'তারা রাতে পাথর মারবে এবং দিনে উট চরাবে'।[৫]

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মিনার রাতগুলোতে প্রত্যেক রাতেই কা'বাঘর যিয়ারত করতেন এবং তাওয়াফ করতেন।[৬] এ হাদীছ প্রমাণ করে, মিনার রাতগুলোতে মিনায় বসে গল্প না করে কিছু সময় বের করে হারামে এসে তাওয়াফ করা যায়। হাজীদের জন্য জরুরী হলো, তারা মসজিদে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করবে আর তার পক্ষে সম্ভব হলে মসজিদে খায়েফে ছালাত আদায় করবে। মসজিদে খায়েফে ছালাত আদায় করা উত্তম। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ

৩. আবূ দাঊদ, হা/১৯৫৯, হাদীছ ছহীহ।
৪. তিরমিযী, হা/৯৫৫, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৩০৩৭।
৫. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৪৭৭।
৬. সিলসিলা ছহীহা, হা/৮০৪।

سَبْعُونَ نَبِيًّا 'মসজিদে খায়েফে ৭০ জন নবী ছালাত আদায় করেছেন'।[৭]

মিনার দিনগুলো শেষ হলে হজ্জের কাজ শেষ হয়ে যায়। এ সময় হারামে চলে যাওয়া ভালো। তারপর মক্কায় অবস্থান করবে এবং হারামে জামাআতে ছালাত আদায় করবে। কারণ রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার এ মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করার চেয়ে ১ হাজারেরও বেশি গুণ নেকী। তবে মসজিদে হারামে ছালাত আদায় ১ লক্ষ গুণ বেশি নেকী'।[৮] অতএব, প্রত্যেক হাজীর জন্য উচিত, হারামে ছালাত আদায়ের আশায় হারামের পাশে থাকা।

বিদায় তাওয়াফ : যখন মানুষের হজ্জের কাজ শেষ হবে ও বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সে যেন তাওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ ত্যাগ করে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, হজ্জ শেষে মানুষ বিভিন্ন পথে বাড়ি ফিরতে লাগল। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কা'বায় সব শেষে তাওয়াফ না করে কেউ যেন বাড়ি না ফিরে।[৯] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাড়ি ফেরার পূর্বমুহূর্তে বিদায় তাওয়াফ করতে হবে এবং দুই রাকআত ছালাত আদায় করতে হবে। তবে বিদায়ের সময় কোনো ঋতুবতী মহিলাকে বিদায় তাওয়াফ করতে হবে না। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, জনগণকে এ মর্মে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বায়তুল্লাহর তাওয়াফ যেন তাদের শেষ কাজ হয়। তবে এ আদেশ ঋতুবতী মহিলাদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।[১০] ঋতুবতী মহিলা বিদায় তাওয়াফ না করে বাড়ি ফিরতে পারে এ শর্তে যে, তারা তাওয়াফে ইফাযা বা তাওয়াফে যিয়ারাহ করেছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا.

৭. ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/১২২৮৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/২০২২; আলবানী, মানাসিকুল হজ্জ ওয়াল উমরা, পৃ. ৩৯।

৮. ইরওয়াল গালীল, হা/১১২৯।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/১৬৩৪।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৫৫।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী ছাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা ঋতুবতী হলেন এবং পরে এ কথাটি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে অবগত করা হলো। তখন তিনি বললেন, সে কি আমাদের যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? তারা বললেন, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারাহ সমাধা করে নিয়েছেন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তো আর বাধা নেই।[১১] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, ঋতুবতীদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা তাওয়াফে ইফাযা করে থাকলে বিদায় তাওয়াফ করা লাগবে না।[১২]

হাজীগণ যমযমের পানি নিয়ে যেতে পারে : কল্যাণের আশায় সম্ভব হলে যমযমের পানি নিয়ে যেতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাত্রে এবং মশকে যমযমের পানি বহন করতেন। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর যমযমের পানি ঢালতেন এবং তাদের পান করাতেন।[১৩] এ হাদীছ প্রমাণ করে, মানুষ যমযমের পানি নিয়ে যেতে পারে এবং তা রোগীদের জন্য ব্যবহার করতে পারে। অতএব, শেষ কথা হলো, সেভাবেই হারাম থেকে বের হতে হবে যেভাবে অন্যান্য মসজিদ হতে বের হয়। তবে পিছন দিকে সরে বের হতে হবে না। বাম পা আগে বের করে এ দু'আ পড়ে হারাম ত্যাগ করবে-

اللَّهُمَّ صل على محمد وسلم اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

যা করা যাবে না :

(১) পাথর মারার পূর্বে বিদায় তাওয়াফ করা।

(২) বিদায় তাওয়াফের পর মক্কায় দীর্ঘ দিন থাকা।

(৩) হারাম ত্যাগের সময় পিছন দিকে হেঁটে বের হওয়া।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের হজ্জের নিয়মকানুন যথাযথভাবে জেনে-বুঝে পালন করার তাওফীক্ব দান করেন এবং আমাদের হজ্জ কবুল করে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন- আমীন!

১১. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৫৭।

১২. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৬০।

১৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৮৩।

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাশিক্ষার বৈষম্য

*-ড. মো. কামরুজ্জামান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে জাকারিয়া। সে ঢাকার দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার ছাত্র। এছাড়া বিগত এক যুগব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা আকাশচুম্বী সাফল্য দেখিয়েছে। প্রথম স্থানসহ অনেক শীর্ষস্থান তারাই দখল করে আসছে। ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল একজন মাদরাসার ছাত্র। নাম তার আব্দুল খালেক। সেবছর প্রথম ১০ জনের ৪ জনই ছিল মাদরাসার শিক্ষার্থী। ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল মাদরাসার শিক্ষার্থী আব্দুল আলীম। দ্বিতীয় হয়েছিল আরেক মাদরাসার ছাত্র সেলিমুল কাদের। এছাড়া তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ স্থান অধিকারী ছিল মাদরাসা ছাত্র। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ঘ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয় মাদরাসার ছাত্র এলিস জাহান। দ্বিতীয় হয় মাদরাসাছাত্র মিজানুল হক। চতুর্থ ও একাদশ স্থানটিও দখল করেছিল ২ জন মাদরাসাছাত্র। ২০১০-২০১১ সেশনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয় মাদরাসাছাত্র মাসরুর বিন আনসারী। 'ঘ' ইউনিটে প্রথম হয় মাদরাসাছাত্র আসাদুজ্জামান। দ্বিতীয় স্থান অধিকারীও ছিল অন্য একজন মাদরাসার ছাত্র। এছাড়া 'খ' ইউনিটে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ১৬তম, ১৭তম ও ১৮তম হয় মাদরাসাছাত্র। ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় 'খ' ইউনিটে প্রথম হয় মাদরাসার ছাত্র আব্দুর রহমান মজুমদার। একই বছরে সে 'ঘ' ইউনিটেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। উল্লেখ্য, মেধাতালিকায় ১০ জনের মধ্যে এ বছর মাদরাসার ছাত্র ছিল তিন জন। আব্দুর রহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েও সর্বাধিক নম্বর পেয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ছিল ২,২২১টি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ৪০ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী। আর উত্তীর্ণ হয়েছিল মাত্র ৩,৮৭৪ জন। আর অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৩৮০ জন। আরও মজার ব্যাপার হলো, এ বছরের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে পাশ করার শর্ত ছিল ১৫ নম্বর পাওয়া। উত্তীর্ণ ৩,৮৭৪ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইংরেজিতে ১৫ নম্বর পেয়ে পাশ করেছিল কলেজের মাত্র দুজন ছাত্র। আর মাদরাসার ছাত্র আব্দুর রহমানের ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর ছিল ২৮.৫০! আর মাদরাসার অন্য দুজন ছাত্রের ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর ছিল ১৫ এর উপরে। অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে আসা কলেজ ছাত্রদের ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল ২২.৫০।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য কথা হলো, মাদরাসার ছাত্রের সাফল্যে সবসময়ই এক ধরনের জ্ঞানপাপীর গাত্রদাহ শুরু হয়। এত সাফল্যের পরও তারা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দুর্বল বলে অভিহিত করেন। মাদরাসায় প্রণীত ১০০ নম্বরের ইংরেজি ও ১০০ নম্বরের বাংলা নাকি এ দুর্বলতার মূল কারণ। অভিযোগের কারণে ২০১৫ সাল থেকে মাদরাসাগুলোতে ২০০ নম্বরের ইংরেজি ও ২০০ নম্বরের বাংলা নতুন করে বাধ্যতামূলক করা হয়। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর মাদরাসার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে না পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মাদরাসা ছাত্ররা জ্ঞানপাপীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পাশের হার ছিল ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এতদসত্ত্বেও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয় মাদরাসাছাত্র আব্দুল্লাহ আল-মামুন। একই ইউনিটে মানবিক শাখা থেকে পরীক্ষা দেওয়া মাদরাসা ছাত্র আব্দুস সামাদ প্রথম হয়। 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয় মাদরাসাছাত্র রিজাত হোসেন। ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় একইভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে মাদরাসাছাত্র আব্দুল্লাহ মজুমদার। এ বছর পাসের হার ছিল ১১ দশমিক ৪৩

* অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শতাংশ। কিন্তু শুধু মাদরাসাছাত্র হওয়ার কারণে আব্দুল্লাহ মজুমদারকে তার পছন্দের সাবজেক্টে পড়তে দেওয়া হয়নি। অনৈতিক ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ আব্দুল্লাহর প্রাপ্য অধিকারকে খর্ব করে দেয়। যা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমান। এত অনৈতিক বাধা-বিপত্তির পরেও ২০১৭-২০১৮ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মাদরাসাশিক্ষার্থীদের অবস্থান ছিল জয়জয়কার। এ বছর ঢাবির 'খ' ইউনিটে একটি মাদরাসা থেকেই চান্স পেয়েছিল ৮৪ জন ছাত্র। এর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৫ জন।

এত সাফল্যের পরেও একটি মাদরাসাকেও সরকারি করা হচ্ছে না। প্রতিবছর শতশত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলেও মাদরাসাগুলো থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিত। অথচ এমন অনেক কলেজ আছে, যেখানে একজন ছাত্রও পাস করেনি। কিন্তু শুধু কলেজ হওয়ার কারণে সেটা জাতীয়করণ হয়ে গেছে।[১] প্রতিবছরই মাদরাসাছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। এমনকি টপ ২০ জনের মধ্যে ১০ জনই থাকে মাদরাসা থেকে আগত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করেন। তাদেরকে ভালো সাবজেক্টে পড়াশোনার সুযোগ দেন না। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৭ কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১৭ নভেম্বর ২০২১। এ কলেজগুলোতে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ১৩২ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ হাজার ৩৮২ জন। আর এদের মধ্যেও প্রথম হয়েছে ঢাকার দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদরাসার ছাত্র নাজমুল ইসলাম। ১২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ১০৭ নম্বর।[২] একইভাবে ২০২০-২১ সালের গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১৭ নভেম্বর ২০২১। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫,৫৪৫ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ হাজার ৪৯৫ জন। আর প্রথম হয়েছে তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা মহিলা শাখার ছাত্রী হামিদা ইসলাম।

দেশের মোট জনশক্তি এখন ১৬ কোটি ৯১ লাখ। বাংলাদেশ সবেমাত্র এল.সি.ডি অতিক্রম করলেও দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কম নয়। 'বিশ্ব ক্ষুধা সূচক ২০২১'-এ ১১৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৬তম। অথচ বর্তমান সরকারের টার্গেট ২০৪১ সালে দেশকে স্বনির্ভর উন্নত বাংলাদেশ উপহার দেওয়া। কিন্তু মাদরাসায় পড়ুয়া অর্ধকোটি জনশক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে টার্গেটে পৌঁছানো আদৌ সম্ভব নয়। তাদেরকে অবহেলিত রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ তারাও এদেশের মানুষ। তারা এদেশটাকে তাদের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। এ বিশাল জনশক্তিকে তাই যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া প্রয়োজন। দেশের জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ দূরীকরণে মাদরাসাশিক্ষার্থীরাই একমাত্র কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সুতরাং সরকারের উচিত তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা। তাদের মাঝে প্রগাঢ় মূল্যবোধ রয়েছে। তাদেরকে এখন কর্মমুখী ও জীবনমুখী করে গড়ে তোলা সময়ের দাবি। তাদের মাঝে ধর্মের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তাদেরকে সতিনের ছেলের মতো দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না। বরং তাদেরকে কাছে টেনে আপন করা উচিত। তাদেরকে বিজ্ঞান ও আবিষ্কারমুখী করে গড়ে তোলা উচিত। স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার মাঝে সৃষ্ট দেয়াল দূরীভূত করা উচিত। তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মোদ্যোগী করা উচিত। এতে দেশের সমন্বিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পরস্পরের মনস্তাত্বিক ব্যবধান দূর হবে। ফলে কর্তৃপক্ষের প্রতি তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল সরকারের উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে।

বের হয়েছে!

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রণীত ও তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত নতুন বই "পোশাক"

■ পৃষ্ঠা : ৯৬
■ মূল্য : ৭৫ টাকা

বইটি পেতে যোগাযোগ করুন!
তুবা পাবলিকেশন

নওদাপাড়া(আমচত্বর), রাজশাহী
মোবাইল নাম্বার : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল নাম্বার : ০১৪০৭-০২১৮৫০

১. দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৪ অক্টোবর, ২০১৬।
২. bdnews24.com, ১৭ নভেম্বর, ২০২১।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (৫ম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ১২তম পর্ব)

হাদীছ নং : ৩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ} فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رضي الله عنها فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟! قَالَ: نَعَمْ. لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ. تابَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صالِحٍ. وتابَعَهُ هِلالُ بْنُ رَدَّادٍ عن الزُّهْرِيِّ. وقالَ يُونُسُ ومَعْمَرٌ: بَوادِرُهُ.

অনুবাদ :

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে লায়ছ হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি বলেন, তাকে উকায়ল হাদীছ শুনিয়েছেন; তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উরওয়া ইবনু যুবায়ের থেকে, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) থেকে, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অহীর আগমন শুরু হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন সেই স্বপ্ন সকালের মতো তার সামনে সত্যরূপে প্রকাশিত হতো। অতঃপর তার কাছে একাকিত্ব ভালো লাগতে লাগল। তিনি হেরা গুহায় একাকী থাকতেন এবং রাত্রিকালীন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন- যতক্ষণ না পরিবারের কাছে ফিরে প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার প্রয়োজন না হতো। অতঃপর তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-এর নিকট ফিরে আসতেন তিনি তার জন্য অনুরূপ পাথেয় প্রস্তুত করে দিতেন। এভাবেই তার নিকট একদিন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী চলে আসে এমতাবস্থায় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। ফেরেশতা তার নিকটে এসে তাকে বললেন, পড়ুন! তিনি বললেন, আমি পড়া জানি না। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং চাপ দিলেন। পুনরায় বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। ফেরেশতা আমাকে পুনরায় ধরলেন এবং চাপ দিলেন অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, পড়ুন! আমি বললাম, আমি পড়া জানি না। তিনি আমাকে আবারও সজোরে চাপ দিলেন অতঃপর তিনি বললেন, 'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাটবাধা রক্ত হতে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার প্রতিপালক মহাসম্মানিত'।

এই আয়াতগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূল ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় তার বুক ধড়ফড় করছিল। তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন, আমাকে চাদর দাও! চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! অতঃপর খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর তার ভয় কেটে গেলে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা)-কে তিনি পুরো ঘটনা জানালেন এবং বললেন, আমি আমার জীবনের ভয় পাচ্ছি। তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনোই নয়! মহান আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের সম্মান করেন, বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করেন। অতঃপর খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা) তাকে সাথে করে নিয়ে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নওফেলের নিকট নিয়ে গেলেন। যিনি জাহেলী যুগে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি হিব্রু ভাষায় বই লিখতেন। তিনি ইঞ্জীল গ্রন্থকে হিব্রু ভাষায় যতদূর আল্লাহ

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

তাওফীক্ব দিয়েছিলেন লিখেছিলেন। তিনি একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ মানুষ ছিলেন। খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে বললেন, হে আমার চাচার ছেলে! আপনার ভাইয়ের ছেলে কী বলে শুনুন! তখন ওয়ারাকা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আপনি কী দেখেছেন? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখেছিলেন তাকে তা জানালেন। অতঃপর ওয়ারাকা বললেন, ইনিই সেই 'নামূস' যাকে মহান আল্লাহ মূসার নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে! তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যিই কি আমার জাতি আমাকে বের করে দিবে? হ্যাঁ, ইতোপূর্বে কোনো ব্যক্তির নিকটে এই লোক প্রেরিত হয়েছেন আর তাকে তার জাতি বের করে দেয়নি এমনটা হয়নি। তবে তোমার সাথে যেদিন এমন ঘটবে সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকি আমি তোমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা রাযিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। আর অহী স্থগিত হয়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ ও আবূ ছালেহ রাহিমাহুল্লাহ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ রাহিমাহুল্লাহ যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার রাহিমাহুমাল্লাহ فؤاده এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

তাখরীজ : ইমাম বুখারী এই হাদীছকে ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র ও আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা দুই জন লায়ছ ইবনু সা'দ থেকে তিনি উকায়ল ইবনু খালেদ থেকে। ইমাম বুখারী হাদীছটি আরও শুনেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ থেকে। ইমাম মুসলিম (কিতাবুল ঈমান, হা/১৬০) হাদীছটি শুনেছেন মুহাম্মাদ ইবনু রা'ফে থেকে। তারা দুই জন (আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবনু রা'ফে) আব্দুর রাযযাক থেকে তিনি মা'মার থেকে। ইমাম মুসলিম (কিতাবুল ঈমান, হা/১৬০) হাদীছটি আরও শুনেছেন আবূত্ব ত্বহের আহমাদ ইবনু আমর থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব থেকে, তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ আল-আয়লী থেকে। ইমাম হাকেম (হা/৪৮৭১) হাদীছটিকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুআয আস-সানআনী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (হা/৩৬৩২) হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্বের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উকায়ল ইবনু খালেদ, মা'মার, ইয়াযীদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মুআয, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সকলেই হাদীছটিকে শব্দের বিভিন্নতা ও অর্থের একতার সাথে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। তথা এই হাদীছের সকল সনদের কেন্দ্রস্থল ইমাম যুহরী। ইমাম যুহরী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন উরওয়া থেকে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে। ইমাম বুখারী হাদীছটি তার ছহীহ বুখারী গ্রন্থে আরও ছয় জায়গায় এনেছেন— কিতাবুল আম্বিয়া (হা/৩৩৯২); কিতাবুত তাফসীর (হা/৪৯৫৩, ৪৯৫৫, ৪৯৫৬, ৪৯৫৭); কিতাবু তাবীর (৬৯৮২)। এছাড়া কুতুবে সিত্তাহর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে শুধু ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী এই হাদীছটি তাদের গ্রন্থে এনেছেন। ছহীহ মুসলিম কিতাবুল ঈমান (হা/১৬০); সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব (হা/৩৬৩২)।

রাবীগণের পরিচয় :

(১) ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র : তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু বুকায়র। লায়ছ ইবনু সা'দের শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মযবূত ছাত্রগণের একজন। তার দাদার নাম বুকায়র। তার দাদার দিকে নিসবাত করেই তাকে স্মরণ করা হয়। তারা দাদার প্রসিদ্ধির কারণে। ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ তার বিষয়ে বলেন, كان غزير العلم، عارفا بالحديث وأيام الناس، بصيرا بالفتوى، صادقا دينا، وما أدري ما لاح للنسائي منه حتى ضعفه، وقال مرة : ليس بثقة. وهذا جرح مردود، فقد احتج به الشيخان، وما علمت له حديثا منكرا حتى أورده 'তিনি অনেক জ্ঞানী ছিলেন। হাদীছ ও ইতিহাস সম্পের্ক জানতেন। ফৎওয়া বিষয়ে সম্যক অবগত ছিলেন। দ্বীনদার পরহেযগার ছিলেন। আর আমি জানি না কেন নাসাঈ তার বিষয়ে দুর্বলতাসূচক মন্তব্য করেছেন। তার এই জারহটি পরিত্যাজ্য। কেননা ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়রের হাদীছ শায়খায়ন গ্রহণ করেছেন। আর আমি তার পক্ষ থেকে কোনো মুনকার হাদীছ পাইনি'।[১]

(২) লায়ছ : তার পূর্ণ নাম। লায়ছ ইবনু সা'দ ইবনু আব্দুর রহমান আল-ফাহমী। তার কুনিয়াত বা উপনাম আবুল হারেছ। তিনি বিখ্যাত ফক্বীহগণের একজন। মিসরের ইমাম হিসেবে তাকে গণ্য করা হতো। ইমাম শাফেঈ তার ফিক্বহের অনেক প্রশংসা করেছেন। তার নামে মাযহাব পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তার ছাত্ররা উস্তাযের ফিক্বহকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি অনেক বড় তাবেঈদের থেকে হাদীছ শুনেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম ইবনু শিহাব যুহরী, সাঈদ আল-মাকবূরী, নাফে ও আতা ইবনু আবী রাবাহ প্রমুখ। লায়ছের ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম মুহাম্মাদ ইবনু আজলান, আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক ও ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র প্রমুখ।

তিনি আরবী সাহিত্য, কবিতা, নাহু-ছরফ ও হাদীছ থেকে শুরু করে ইলমের সকল জগতে ভালো পারদর্শিতা রাখতেন। তার সাথে ইমাম মালেকের কিছু চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল। তবে তিনি মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক থেকে শুনেছেন কিনা এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তিনি অনেক টাকা-পয়সার মালিক ছিলেন। প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার দীনার ইনকাম করতেন। কিন্তু এত পরিমাণে দান করতেন যে, যাকাত দেওয়ার সম্পদ কোনো সময়ই

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৬১৩।

তার কাছে এক বছর জমা থাকেনি। ফলত তিনি কখনো যাকাত আদায় করতে পারেননি। ইমাম শাফেঈ বলেন, ইমাম মালেকের চেয়ে লায়ছ বেশি ফিক্বহ বুঝতেন। কিন্তু তার ছাত্ররা তার জ্ঞানের যত্ন নেয়নি। ক্বাযী ইবনু খাল্লিকান বলেন, ইমাম লায়ছ নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।[২]

(৩) উকায়ল : আইনে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। আকীল পড়লে ভুল হবে, কেননা তার দাদার নাম আকীল। আইনে যবর ও কাফে যের দিয়ে। তার পূর্ণ নাম হচ্ছে উকায়ল ইবনু খালেদ ইবনু আকীল। তিনি উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত গোলাম।

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, أثبت من روى عن الزهري مالكٌ، ثم مَعْمَرٌ، ثم عُقيل 'ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনাকারী সবচেয়ে মযবূত ছাত্রগণ হচ্ছেন ইমাম মালেক, মা'মার ও উকায়ল'।[৩]

(৪) যুহরী : তিনি আল-ইমাম আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু ওবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু শিহাব আয-যুহরী। শামের অধিবাসী। বিখ্যাত তাবেঈ। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখেছেন কিন্তু তার থেকে হাদীছ শুনেননি। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও সাহল ইবনু সা'দ আস-সায়িদী রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ প্রমুখ ছাহাবী থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন। তার শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে হওয়ার ফলে তিনি বহু হাদীছের সনদেও কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে গেছেন। সব সনদ তার কাছে এসে জমা হয়েছে আবার তার কাছে থেকে বিভিন্ন সনদে রূপ নিয়ে পুরো দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। তার স্মৃতিশক্তি প্রচণ্ড প্রখর। তিনি মাত্র ৮০ দিনে কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি যা শুনেন তা তিনি ভুলেন না। তার মযবূতী ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। তবে তিনি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করতেন। তার বর্ণিত মুরসাল হাদীছ তাহক্বীক্বের পরেই গ্রহণ করতে হবে।[৪]

(৫) উরওয়া ইবনু যুবায়র ইবনু আওয়াম : পূর্বে আলোচনা হয়ে গেছে।

(৬) আয়েশা বিনতু আবী বাকর : পূর্বে আলোচনা হয়ে গেছে।

সনদের সূক্ষ্মতা :

(১) আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই ঘটনা দেখেননি বা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। এই ঘটনার সময় তার জন্মই হয়নি। হয় তিনি ঘটনাটি স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, তাহলে এটা তার নিজের মুসনাদ। অথবা তিনি এই ঘটনা অন্য ছাহাবী থেকে শুনেছেন, তাহলে এটা তার জন্য মুরসাল। ছাহাবীগণ যে সমস্ত বর্ণনা অন্য ছাহাবী থেকে শুনে বর্ণনা করেন সে সমস্ত বর্ণনাকে মুরসাল ছাহাবী বলা হয়। নামকরণের দিক থেকে তা মুরসাল ছাহাবী হলেও হুকুমের দিক থেকে তা মুসনাদ মুত্তাছিল বা সংযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য। কেননা যেহেতু সকল ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ সেহেতু ছাহাবীর জাহালাত বা অপরিচিত হওয়াতে কোনো সমস্যা নাই। অতএব, বর্ণনাকারী ছাহাবী অন্য যে ছাহাবী থেকে হাদীছটি শুনলেন তা জানা না থাকলেও সমস্যা নাই।

(২) এই হাদীছের সব রাবী কুতুবে সিত্তাহর রাবী। শুধু ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র ব্যতীত।

(৩) এই সনদে পরস্পর দুইজন তাবেঈ একজন আরেকজন থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যুহরী উরওয়া থেকে।

(৪) হাদীছের শেষে ইমাম বুখারী এই হাদীছের কিছু মুত্বাবাআত ও বর্ণনার পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو صَالِحٍ এই বক্যের তাবাআহু-এর সর্বনাম দ্বারা ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র উদ্দেশ্য। তথা ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়রের মুত্বাবাআত করেছে আরও দুইজন আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ও আবূ ছালেহ। তথা উক্ত হাদীছটি ইমাম বুখারী তিন জন শায়খের থেকে শুনেছেন এক জনের নাম তিনি মূল হাদীছের সাথে নিয়েছেন আর বাকী দুই জনের নাম তিনি মুত্বাবাআত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই তিন জন তথা ইয়াহইয়া, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ ও আবূ ছালেহ সকলেই হাদীছটি লায়ছ ইবনু সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَتَابَعَهُ هِلاَلُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

এখানে সর্বনাম দ্বারা উকায়ল উদ্দেশ্য। তথা ইমাম যুহরী থেকে এই হাদীছটি শুধু উকায়ল বর্ণনা করেছে এমন নয়; বরং হাদীছটি ইমাম যুহরী থেকে হেলাল ইবনু রাদ্দাদও শুনেছে।

وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ.

এখানে ইমাম বুখারী বর্ণনার পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ হাদীছে ইমাম যুহরী থেকে যখন উকায়ল বর্ণনা করেছে তখন সেখানে আল্লাহর রাসূলের ভীতসন্ত্রস্ত বুঝাতে গিয়ে অন্তরের আরবী শব্দ ফুয়াদ ব্যবহার করা হয়েছে। তথা তার অন্তর কাঁপছিল বা ধকধক করছিল। অন্যদিকে ইউনুস ও মা'মার যখন হাদীছটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছে তখন তারা ফুয়াদের পরিবর্তে বাদিরাতুন এর বহুবচন বাওয়াদির ব্যবহার করেছে। তথা কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যের জায়গা কাঁপছিল।

---

২. আজুলুনী, ফায়যুল জারী, ১/১৪৭।

৩. তাযকিরাতুল হুফফায, ১/১৬১।

৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১০/৪৫।

হক্বের মানদণ্ড

মূল (উর্দূ) : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ

*অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান**

(পর্ব-৪)

⇒ তাদের দাবি অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন।

তাহক্বীক্ব : তাদের এই মিথ্যা দাবির তাহক্বীক্বে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের ২৬ বছর পূর্বে ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর ২৬ বছর পর ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। তবে কারো মতে, আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু ৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এই বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ৬ বছর পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই মর্মে আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর কিতাব 'তাক্বরীবুত তাহযীব'-এ বলেছেন, عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحي المدني حليف الأنصار صحابي شهد العقبة واحدا ومات بالشام في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين ووهم من قال سنة ثمانين 'আনছারদের মিত্র আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস আল-জুহানী আবূ ইয়াহইয়া আল-মাদানী একজন ছাহাবী। যিনি একবার 'আক্বাবা'-তে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতের সময়ে ৫৪ হিজরীতে সিরিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন। আর যারা বলেছেন, ৮০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের কথায় সংশয় রয়েছে।[১]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি ৭৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, ৫৪ হিজরীতে।[২] আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু মর্মে যে বর্ণনাই গ্রহণ করা হোক না কেন তার মৃত্যু ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের পূর্বে হয়েছে এ কথাই প্রমাণিত। সুতরাং কীভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার থেকে একটি হাদীছ শুনেছেন? (অর্থাৎ সরাসরি মিথ্যা দাবি মাত্র)। যদি কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের পূর্বে যে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি হলেন আব্দুল্লাহ আল-জুহানী। আর ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ যে আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি ভিন্ন আব্দুল্লাহ।

জবাব : যারা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাক্ষাতের দাবি করেছেন তারা এই আব্দুল্লাহকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন অন্য কেউ নয়। কেননা কেবল তিনিই কূফা নগরীতে গিয়েছিলেন। কেননা লেখক পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, তুহত্বাবীর মধ্যে উল্লেখ আছে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ১৪ বছর বয়সে ৯৪ হিজরীর পরে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীছ শুনেছেন...। রাদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য গ্রন্থেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই বাস্তবতা যে, ঐ আব্দুল্লাহ কূফী নয়; বরং জুহানী। কেননা জুহানী ব্যতীত অন্য কোনো আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস কূফা নগরীতে গমন করেননি। মুহাক্বিক্ব ইবনুল আবেদীন আশ-শামী রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলেছেন, وأجيب بأن هذا الإسم لخمسة من الصحابة فلعل المراد غير الجهني و رد بأن غيره لم يدخل الكوفة 'আব্দুল্লাহ নামে পাঁচ জন ছাহাবী রয়েছেন। সম্ভবত এখানে জুহানী ব্যতীত অন্য আব্দুল্লাহ উদ্দেশ্য।

জবাব : আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস আল-জুহানী ব্যতীত অন্য কোনো আব্দুল্লাহ নামের ছাহাবী কূফা নগরীতে প্রবেশ করেননি।[৩] 'তানভীরুল হক্ব'-এর লেখক শাহ পাক পাটনী এই হাদীছটি তুহত্বাবী থেকে নকল করে বলেছেন, ৯৪ হিজরীতে ১৪ বছর বয়সে কূফা নগরীতে আব্দুল্লাহ থেকে উক্ত হাদীছটি শুনেছেন। এখন প্রশ্ন হলো– আব্দুল্লাহ তো ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাহলে ৯৪ হিজরীতে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে তার সাক্ষাৎ (হাদীছ শ্রবণ করা) কী করে সম্ভব?! দ্বিতীয়ত, যে সনদে উক্ত হাদীছটি ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে সে সনদের মধ্যে দুই জন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছে। এ জন্য মুহাক্বিক্ব বিদ্বানগণ উক্ত বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনুল আবেদীন আশ-শামী রাহিমাহুল্লাহ রাদ্দুল মুখতার গ্রন্থে বলেছেন, অনেকে আব্দুল্লাহ আল-জুহানীর সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করি। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস আল-জুহানী রাযিয়াল্লাহু আনহু ৯৪ হিজরীতে কূফা নগরীতে আগমন করেন। আমি তাকে দেখেছি ও তার থেকে হাদীছ শুনেছি।

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৬৮।

২. তাহযীবুল আসমা, তরজমা নং ২৮৬, ২/২৬১।

৩. রাদ্দুল মুহতার, 'ভূমিকা', ১/৪৫।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, حبك الشيء يعمي ويصم 'কোনো কিছুর অতিমাত্রার ভালোবাসা মানুষকে অন্ধভক্ত ও বধির বানিয়ে দেয়'। আপত্তি হচ্ছে- ১. এই হাদীছের সনদে দুই জন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছে এবং ২. ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু আনহু ৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৪]

তাহলে বুঝা গেল, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। সকল মুহাক্কিকের কথা বাদ দিলেও শুধু ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত দুই জন ছাহাবী ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর জন্মের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইনছাফের সাথে বলুন তো মৃত ছাহাবীর সাথে সাক্ষাতের দাবি করা বিবেক ও দলীলের বিপরীত নয় কি?! আবার ইমাম নববীর বক্তব্যকে সাক্ষাৎ প্রমাণে দলীল হিসাবে পেশ করা কত বড় মিথ্যা অপবাদ! আর লেখক শাহ পাটনী কতবড় সাহসী যে, নিজেই নিজের বিবেক ও দলীলের সাথে সংঘর্ষ করছে। আর অনুবাদকারী তার উপর নির্ভর করে ধোঁকা খেয়েছেন।

আয়েশা বিনতু আজরাদ (রহ.)-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ যদিও প্রমাণিত বলে মেনে নেওয়া হয়, তবুও তার সাথে সাক্ষাতের কারণে ইমাম আবূ হানীফা তাবেঈর স্বীকৃতি পাবে না। কেননা আয়েশা বিনতু আজরাদ ছাহাবী ছিলেন না। শায়খুল ইসলাম হাদীছ এবং আসমাউর রিজালের হাফেয মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আবূ আব্দুল্লাহ আয-যাহাবী তুর্কিমানীর (যার মর্যাদা সম্পর্কে ছোট-বড় সকল আলেম অবগত) বক্তব্য সেটিই প্রমাণ করে। অনুরূপ শায়খুল ইসলাম হাফেযুল হাদীছ ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য দ্বারাও প্রমাণিত। ইবনুল আবেদীন আশ-শামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, بنت عجرد اسمها عائشة واعترض بأن حاصل كلام الذهبي وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني أن هذه لا صحبة لها وأنها لا تكاد تعرف 'বিনতু আজরাদ অর্থাৎ আজরাদের মেয়ে আয়েশার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। ইমাম যাহাবী এবং শায়খুল ইসলাম ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, সে তার সাহচর্য লাভ করেনি এবং চেনার প্রশ্নও আসে না'।[৫] সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আয়েশা বিনতু আজরাদ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এমন কথা অগ্রহণযোগ্য। শামী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

بذالك رد ما روي عنها هذا الحديث الصحيح "أكثر جند الله في الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه.

এর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় যে, 'ইমাম আবূ হানীফা আয়েশা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৬] যুক্তির নিরীখে ও স্বাভাবিকভাবে ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা'র সাথে ইমাম আবূ হানীফার সাক্ষাৎ অসম্ভব। নির্ভরযোগ্য কোনো ইমাম তার থেকে কোনো হাদীছ বর্ণনা না করাও প্রমাণ করে যে, ছাহাবীর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাতের বিষয়টি প্রত্যাখ্যাত। স্বাভাবিকভাবে অসম্ভবের কারণ হলো— সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াছেলা রাযিয়াল্লা-হু আনহু ৮৫ হিজরীতে সিরিয়ার দামেশক নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম আবূ হানীফার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। আর ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ পাঁচ বছর বয়সে ওয়াছেলা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দামেশক গিয়েছিলেন, তা প্রমাণিত নয়। যুক্তির দাবিতেও এটা অসম্ভব যে, তিনি পাঁচ বছর বয়সে এমন সফর করতে পারেন! ওয়াছেলা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মৃত্যু এবং মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী এবং ইমাম নববী রাহিমাহুমাল্লাহ-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যই স্পষ্ট প্রমাণ :

واثلة بن الأسقع ابن كعب الليثي صحابي مشور نزل الشام وعاش إلي سنة خمس وهو ابن ثمان و تسعين قال له أبو مسهر وقال سعيد بن خالد توفى سنة ثلث و ثمانين وهو ابن مائة وخمس سنين.

'ওয়াছেলা ইবনুল আছক্বা' (ইবনু কা'ব আল-লায়ছী) একজন প্রসিদ্ধ ছাহাবী ছিলেন। তিনি শাম দেশে আগমন করেছিলেন এবং তিনি সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেন। তখন তার বয়স ৯৮ বছর। আবূ মুসহিরও এমনটি বলেছেন। আর সাঈদ ইবনু খালেদ বলেছেন, তিনি ৮৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তার বয়স ১০৫ বছর।[৭]

ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা'র মৃত্যু ও বয়স বিষয়ে বর্ণিত মতগুলোর মধ্য হতে আমরা ইমাম নববী ও হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুমাল্লাহ-এর মতটি গ্রহণ করলাম। আর বাকি দুটি মতও আমাদের পক্ষে। বিশেষ করে সাঈদ ইবনু খালেদের মতটি বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা এই মতের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয় যে, ওয়াছেলা ইবনুল আছক্বা' রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মৃত্যুর সময় ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর বয়স মাত্র তিন বছর ছিল।

লেখক শাহ পাক পাটনী এবং তার মতালম্বীদের দাবি অনুযায়ী আব্দুল্লাহ ইবনু জায' রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ৯৬ হিজরীতে সাক্ষাৎ করেছেন যা বিবেক বহির্ভূত অসম্ভব বিষয়। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু জায' ৮৬ হিজরীতে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। এই মর্মে ইবনু হাজার

৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃ. ৩৬৮।

আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, عبد الله بن الحارث بن جزء صحابي أبو حارث سكن مصر وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان وثمانين والثاني أصح ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ ইবনু জায’ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু একজন ছাহাবী ছিলেন। তিনি মিসরে বসবাস করতেন এবং ৮৫, ৮৬, ৮৭ অথবা ৮৮ হিজরীতে মিসরে মারা যান। মিসরে ছাহাবীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী ছাহাবী ছিলেন’।[৮]

মুহাক্বিক্ব আল্লামা শামী এবং ইবনু তাহেরের বর্ণনানুযায়ী আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর মৃত্যুও উক্ত হিজরীতে হয়েছিল। সামনে এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে। তাহলে প্রমাণিত হয় যে, ইবনু জায’-এর মৃত্যুর সময় ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর বয়স ছিল ছয় বছর। সুতরাং কীভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ১৬ বছর বয়সে ৯৬ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনু জায’-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার থেকে দুইটি হাদীছ শুনেছেন?

এসব লেখকের গবেষণার ভুল, ইলমী ঘাটতি এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে। তাদের এসব দাবি যে মিথ্যা তা ইবনুল আবেদীন হানাফী রাহিমাহুল্লাহ রাদ্দুল মুখতারে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ৯৬ হিজরীতে হজ্জ করেছেন। তখন মসজিদে হারামে আব্দুল্লাহ ইবনু জায’ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-কে পাঠদান করতে দেখেন এবং তার থেকে দুইটি হাদীছ শুনেছেন— এসব বর্ণনাকে একদল প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা এসব বর্ণনার সূত্রে বিভিন্ন রদবদল রয়েছে। আর একথা সর্বসম্মতিক্রমে মিথ্যা যে, ইবনু জায’ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। কেননা তখন ইমাম আবূ হানীফার বয়স ছয় বছর ছিল; আর আব্দুল্লাহ ইবনু জায’ কখনো কূফা নগরীতে গমন করেননি।[৯]

সতর্কবাণী : এই কথা দাবি করা যে, জাবের রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষাৎ হয়েছে, যিনি তাঁর জন্মের এক অথবা দুই বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে, যিনি ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর ২৬ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। অনুরূপভাবে ৯৬ হিজরীতে ইবনু জায’ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে, যিনি ৮৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এসব কাণ্ডজ্ঞানহীনদের থেকে এমন কথার উদ্ভব নতুন নয়! কেননা যে বলতে পারে খাযির আলাইহিস সালাম ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে ৩০ বছর যাবৎ জ্ঞান অর্জন করেছেন। যার পাঁচ বছর ইমামের জীবদ্দশায় এবং ২৫ বছর মৃত্যুর পর কবরে। এরাও তো তাদেরই ভাই। সুতরাং এরা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর সাথে দুই-তিন জন ছাহাবীর সাক্ষাতের দাবি করা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা গোঁড়ামি ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার দিক থেকে তারা সবাই সমান। সুতরাং ভেবে দেখুন!

﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ﴾

‘আর মুহাজির ও আনছারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা সুন্দরভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসফলতা’ *(আত-তওবা, ৯/১০০)*।

উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে মৌলবী মুহাম্মাদ শাহ পাক পাটনী বলেছেন, অন্য ইমামদের তুলনায় ইলমের আধিক্য এবং মর্যাদা ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-কে বাকি তিন ইমামের উপর উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। কেননা বাকি তিন ইমামের মাঝে এই গুণ ও মর্যাদা পাওয়া যায় না। কেননা ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ৯৩, ৯৪ অথবা ৯৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি আবূ তুফায়ল রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এমনটি জানা যায় না। কেননা সেসময় তার মক্কায় গমনের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। বরং ইবনু ছালাহ বলেছেন, ইমাম মালেক তাবে-তাবেঈ ছিলেন অর্থাৎ তার সাথে কোনো ছাহাবীর সাক্ষাৎ হয়নি। আর ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ ২৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম মালেক রাহিমাহুমাল্লাহ-এর ছাত্র ছিলেন। আর আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্যাদা মুজতাহিদ বিদ্বানগণের অনেক ঊর্ধ্বে।

জবাব : ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের উদ্দেশ্যে তখনই পৌঁছাতেন যদি তিনি তাবেঈ হতেন। তিনি যে তাবেঈ নয়, তা পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং বাকি তিন ইমামের চেয়ে ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদার আধিক্য যদি তাবেঈ হওয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, তাহলে তা আর নেই। সুতরাং তাবেঈ না হওয়ার দৃষ্টিতে চার ইমাম সমান মর্যাদার অধিকারী। যেহেতু তারা

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ‘শিক্ষার্থীদের পাতায়’)

৮. প্রাগুক্ত।

৯. রাদ্দুল মুহতার, ১/৫৪; তাযকিরাতুল মাউযূআত, পৃ. ১১১; আল-ই'লালুল মুতানাহিয়া, ১/১২৮।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইলম গোপন রাখার হাদীছের ব্যাখ্যা

-আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী*

ভূমিকা : একজন বক্তা একদা বলে বসলেন, 'আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু যে হাদীছের মধ্যে ইলমের পাত্র গোপন রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সেটি মূলত কিয়ামতের আলামত বিষয়ক। অর্থাৎ কিয়ামত সংশ্লিষ্ট কিছু আলামতের কথা তিনি ভয়ে বলেননি। যদি বলতেন, তাহলে তার গলা কেটে ফেলা হতো'।

উক্ত বক্তা সাহেবের এমন বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর কিছু দ্বীনী ভাই বিষয়টি নিয়ে একটি লেখা লিখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের পরামর্শ ধরেই এই ছোট্ট লেখাটি রচিত হলো। আশা করি, এই ছোট্ট লেখনীই আপনাদেরকে সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইলম গোপন রাখার হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা : হাদীছের ব্যাখ্যা জানার পূর্বে আমাদেরকে প্রথমে হাদীছটি অধ্যয়ন করতে হবে, যা নিম্নরূপ—

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইলমের দুটি পাত্র সংরক্ষণ (অর্জন) করেছি। একটি আমি প্রসার করেছি। আর অপর পাত্রে থাকা ইলম যদি আমি প্রচার করি, তাহলে আমার গলার রগ কেটে ফেলা হবে।[১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীছে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু যে অন্য ইলমটি গোপন করেছেন, তা জানার কোনো উপায় নেই। কেননা তিনি উল্লেখ করেননি। যেহেতু তিনি উল্লেখ করেননি, তার কোনো তাবেঈ ছাত্রও বিষয়টি বলে যাননি। সেহেতু আমাদের পক্ষে তা জানাও সম্ভব নয়।

যখন স্বয়ং আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি স্পষ্ট করেননি; তখন অন্য লোকেরা কি আলেমুল গায়েব হয়ে গিয়েছেন যে, তারা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরের কথা জেনে বসে আছেন?!

তবে (অন্যান্য হাদীছের আলোকে) এতটুকু কথা নিশ্চয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, এই ইলম দ্বারা আহকাম ও মাসায়েল বিষয়ক ইলমকে বুঝানো হয়নি। কেননা এগুলো গোপন রাখা জায়েয নয়। উপরন্তু আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু জানের ভয়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যা দ্বারা ইশারা পাওয়া যায়, এর দ্বারা ফেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় হতে পারে।

ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭১ হি.) এ হাদীছ সম্পর্কে আহলে ইলমের ব্যাখ্যা পেশ করে বলেন,

قَالَ عُلَمَاؤُنَا وَهَذَا الَّذِي لَمْ يَبُثَّهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الْفِتْنَةَ أَوِ الْقَتْلَ إِنَّمَا هُوَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْفِتَنِ وَالنَّصِّ عَلَى أَعْيَانِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَنَحْوَ هَذَا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

আমাদের আলেমদের বক্তব্য হলো, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু যে ইলমকে গোপন করেছিলেন এবং যেটি প্রসার করলে ফেতনা ও কতলের ভয় করেছিলেন, সেটির দ্বারা ঐ ইলম উদ্দেশ্য, যার সাথে ফেতনাসমূহের সম্পর্ক রয়েছে। যার মধ্যে মুরতাদ ও মুনাফেক্বদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেগুলো এমন বিষয়, যার সাথে দলীল ও হেদায়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।[২]

অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা কেবল এতটুকুই বলতে পারি যে, এর দ্বারা ঐ ইলমকে বুঝানো হয়েছে, যার সাথে ফেতনার সম্পর্ক রয়েছে। এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হয়ে কোনো উদ্ভট ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিয়ামতের আলামতের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। সেগুলো বাদ দিয়ে কিছু মনগড়া হাদীছ নিজের পক্ষ হতে অপব্যাখ্যা করে সেটিকে বৈধতা প্রদানের জন্য বুখারীর উক্ত হাদীছকে ঢাল বানানো ফেতনা বৈ কিছুই নয়।

বাতেনী ইলম : অনেকেই এ হাদীছ দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য বাতেনী ইলম তথা ইলমে লাদুন্নীকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যা মোটেও ঠিক নয়। কেননা এ হাদীছ

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১২০।

২. আল-জামে লি আহকামিল কুরআন, ২/১৮৬।

দ্বারা বাতেনী ইলমকে উদ্দেশ্য করার কোনো নযীর সালাফদের মাঝে পাওয়া যায় না।

ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু **:** অনেকে এ হাদীছটি দ্বারা মুসলিমদের খলীফা ও শাসক ইয়াযীদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রমাণে সচেষ্ট থাকেন। কিছু মানুষ নিজের কথার সমর্থনে ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যে, হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ ইয়াযীদকে ঐ সকল নিকৃষ্ট শাসকদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যাদের প্রতি আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু এ হাদীছে ইশারা করেছেন।

এর জবাব হলো, হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ কয়েকটি বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল ধারণায় পতিত হয়েছেন। যেগুলোর মধ্য হতে কিছু বর্ণনা ছহীহ ও অপ্রমাণিত এবং কিছু বর্ণনার মর্ম ভিন্ন। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ (৮৫২ হি.) বলেছেন,

حَمَلَ الْعُلَمَاءُ الْوِعَاءَ الَّذِي لَمْ يَبُثَّهُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا تَبْيِينُ أَسَامِي أُمَرَاءِ السُّوءِ وَأَحْوَالِهِمْ وَزَمَنِهِمْ وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَكُنِّي عَنْ بَعْضِهِ وَلَا يُصَرِّحُ بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُمْ كَقَوْلِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ رَأْسِ السِّتِّينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ يُشِيرُ إِلَى خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةَ سِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু যে ইলমের প্রকাশ করেননি, সে বিষয়টিকে আলেমগণ ঐ হাদীছগুলোর উপর গণ্য করেছেন যেগুলোর মধ্যে মন্দ শাসক এবং তাদের অবস্থা ও তাদের শাসনকালের বর্ণনা রয়েছে। আর আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্য হতে কতিপয়ের প্রতি ইশারা করতেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে বলতেন না। যেমন আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এই বক্তব্য রয়েছে যে, আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছি ৬০ (হিজরী) সনের সূচনালগ্নের এবং শিশুদের ইমারত হতে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ইশারা ইয়াযীদ ইবনু মুআবিয়ার খেলাফতের প্রতি ছিল। কেননা এই খেলাফত ৬০ হিজরী সনে ছিল।[৩]

জবাবে বলতে হয় যে, এখানে হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিস্বরূপ বলেছেন, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু ৬০ হিজরী সনের থেকে এবং শিশুদের (কমবয়সী শাসক উদ্দেশ্য) খেলাফত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অর্থাৎ হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ ৬০ হিজরী সংক্রান্ত বর্ণনাটির ভিত্তিতে এটা অনুধাবন করেছেন যে, ৬০ হিজরী সনের সময়টাই হলো কমবয়সী শাসকের শাসনকাল। অথচ এই বর্ণনা থেকে এমনটা অনুধাবন করা ভুল। ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ যে হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নরূপ—

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬০ সনের ফেতনা হতে পানাহ চাইতেন।[৪]

তাহক্বীক্ব : প্রথমত, এখানে ইয়াযীদের নাম নেই। **দ্বিতীয়ত,** নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ কথা বলেছিলেন, তখন হিজরী সন বলে কিছু ছিল না। বরং তিনি ৬০ বছর পরের কথা বলেছিলেন। সে হিসেবে তিনি ৭০ হিজরীর কথা বলেছিলেন। আর ইয়াযীদ ৬৫ হিজরীতে মারা গেছেন। একটি ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘৭০ সনের শুরু হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও এবং ছেলেদের শাসন হতে আশ্রয় চাও’।[৫]

এই হাদীছে স্পষ্টভাবে ৭০ সনের কথা রয়েছে, যা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পরের ৭০ বছর। এটা মূলত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনকাল।

উপরন্তু হাফেয ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ-এর মতের বিস্তারিত খণ্ডনও পেশ করা হয়েছে। যা আমরা পরবর্তী কোনো এক প্রবন্ধে পেশ করব ইনশাআল্লাহ। সুতরাং, যেহেতু আসল ভিত্তিটাই ভুল, সেহেতু সেই ভুলের আলোকে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীছে বর্ণিত গোপন ইলমের ব্যাখ্যা করাও ভুল।

উপসংহার : উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা কিয়ামতের আলামত, ইলমে বাতেনী কিংবা ইয়াযীদের কথা বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু ‘কাকে’ বা ‘কী’ বুঝিয়েছেন তা কেবল আল্লাহই জানেন। আমরা কোনরূপ ধারণার ভিত্তিতে মত প্রদান থেকে বিরত থাকব। নতুবা ফেতনা বাড়তে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১/২১৬।

৪. আহমাদ, ৩/৩৮।

৫. আহমাদ, ১৫/৪৮৬, আলবানী ছহীহ বলেছেন; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩১৯১।

রামাযানের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফযীলত

*-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

আরবী মাসসমূহের নবম মাস হচ্ছে রামাযান মাস। এ রামাযান অন্য সকল মাস অপেক্ষা উত্তম ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ মাসের অর্জিত জ্ঞান অন্য সকল মাসে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের জীবন সুন্দর ও আলোকিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা এ মাসে ছিয়াম আমাদের ওপর ফরয করেছেন। তিনি বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়ামকে ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পারো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

রামাযান শব্দের পরিচয় :

আরবী শব্দ (رمضان) মূল ধাতু থেকে নির্গত। যার আভিধানিক অর্থ হলো— জ্বালানো, পোড়ানো, দগ্ধ বা ভস্ম করা। ভাষাবিদ ইবনু সিক্কীত বলেন, আরবরা এ মাসে তাদের যুদ্ধাস্ত্রকে জ্বালিয়ে মেরামত করত তাই এ মাসকে রামাযান নামে নামকরণ করা হয়েছে।[১] কেউ কেউ বলেছেন, এ মাসে নেক আমলের মাধ্যমে গুনাহসমূহকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।[২]

রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। রামাযানের ছিয়াম ইসলামের মৌলিক ফরযগুলোর একটি। আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ছিয়াম ফরয করে দিয়েছেন। ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত তন্মধ্যে রামাযান মাসের ছিয়াম অন্যতম। যেমন হাদীছে এসেছে—

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলাম পাঁ চটি ভিত্তির উপর স্থাপিত— ১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, ২. ছালাত ক্বায়েম করা, ৩. যাকাত দেওয়া, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রামাযানের ছিয়াম পালন করা'।[৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক বেদুঈন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে অন্য কাওকে শরীক করো না, ফরয ছালাত ক্বায়েম করো, ফরয যাকাত আদায় করো এবং রামাযান মাসের ছিয়াম রাখো'। লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না। যখন লোকটি ফিরে গেল তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাতী লোক দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে'।[৪]

রামাযানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি হতভাগ্য। আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রামাযান মাস শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُومٍ 'তোমাদের নিকট এ মাস সমুপস্থিত। এতে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হলো সে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। কেবল বঞ্চিত ব্যক্তিরাই তা থেকে বঞ্চিত হয়'।[৫]

মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকে, শুধু তার প্রভুর ভয়ে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে ছিয়ামের প্রতিদান হিসেবে অগণিত ছওয়াব দিবেন।

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. আল্লামা আবূ হায়ান আল-আন্দালুসী, তাফসীর আল-বাহার আল-মুহীত, দারুল ফিকর, ২/১।

২. আর-রাযী ফখরুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন উমার, মাফাতিহুল গাইব, দারুল কিতাব আল ইলমিয়্যা (বৈরুত, ২০০০ ইং), ৫/৭১।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৮।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৯৭।

৫. ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪৪, ছহীহ তারগীব, হা/৯৮৯, ৯৯০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ছিয়াম ঢালস্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মূর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি ছিয়াম পালন করছি। ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট; সে আমার জন্য আহার, পান ও কামপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ছিয়াম আমারই জন্য। তাই এর পুরস্কার আমি নিজেই দান করব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময় ১০ গুণ'।[৬]

এ মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় অধিকহারে নেক আমল করার এবং আমলকারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য। আর জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় ঈমানদারদের গুনাহ কম অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে। শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, যাতে সে অন্যান্য মাসের মতো এ মোবারক মাসে মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যেতে না পারে। হাদীছে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন শয়তান ও অভিশপ্ত জিনদের শৃঙ্খলিত করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, এর একটি দরজাও বন্ধ হয় না এবং একজন ঘোষক ডেকে বলেন, হে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি! অগ্রসর হও, হে অসৎকর্মপরায়ণ! থেমে যাও। আল্লাহ (রামাযানের) প্রতিটি রাতে অসংখ্য লোককে জাহান্নাম থেকে নাজাত দেন'।[৭]

ছিয়াম পালনকারীর জন্য বিশেষ মর্যাদা রয়েছে তাই আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে 'রাইয়্যান' নামে একটি বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَهْلٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

সাহল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে ক্বিয়ামতের দিন ছিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেওয়া হবে, ছিয়াম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যাতে করে এ দরজাটি দিয়ে আর কেউ প্রবেশ না করে'।[৮]

রামাযান মাসের ফযীলত :

মহিমান্বিত রামাযান, যা ইবাদতের মহৎ মওসূম। যে মাসে আল্লাহ তাআলা নেক আমলের ছওয়াব সীমাহীন বৃদ্ধি করে দেন এবং দান করেন অফুরন্ত কল্যাণ। উন্মুক্ত করেন নেক কাজে উৎসাহী ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সকল দ্বার। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। কল্যাণ ও বরকতের মাস। পুরস্কার ও দানের মাস। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ 'রামাযান মাস, যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা বিশ্ব মানবের জন্য হেদায়াত, সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*।

রামাযান মাসে রয়েছে অনেক মর্যাদা, যা অন্য কোনো মাসে নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে; যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে'।[৯]

রামাযান মাসে ছিয়াম রাখার পাশাপাশি অন্য ইবাদত করারও অনেক ছওয়াব। যেমন কেউ যদি রামাযান মাসে উমরা পালন করে তাহলে সে হজ্জের সমান ছওয়াব পাবে।

৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৪।
৭. ইবনু মাজাহ, হা/১৬৪২, সনদ ছহীহ।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৯৬।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩।

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّى مَعَنَا قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِى فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

আতা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আনছারী মহিলাকে বললেন, 'আমাদের সাথে হজ্জ করতে তোমাকে কীসে বাঁধা দিল?' মহিলা বলল, আমাদের পানি বহনকারী মাত্র দুটি উট ছিল। আমার ছেলের বাপ ও তাঁর ছেলে একটিতে চড়ে হজ্জ করেন এবং অপরটি আমাদের জন্য পানি বহনের উদ্দেশ্যে রেখে যান। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'রামাযান মাস আসলে তুমি উমরা করো। কারণ এ মাসের উমরা একটা হজ্জের সমান'।[১০] রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানসহ ছওয়াব প্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[১১]

রামাযান মাসে সৎকাজ করলে অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেকগুণ ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা রামাযান মাসের রয়েছে নিজস্ব সম্মান ও মর্যাদা, যা অন্যান্য মাসের নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজের ছওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কেননা তা শুধু আমার জন্য এবং আমিই তার পুরস্কার দিব'।[১২]

ছিয়াম পালনকারীর জন্য কিয়ামতের দিন ছিয়াম সুপারিশ করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ اَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتَ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِىْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ 'ছিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনাচার হতে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আল্লাহ! আমি রাতের ঘুম থেকে তাকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে'।[১৩]

আল্লাহ তাআলা সকল ইবাদতের মধ্য থেকে ছিয়ামকে নিজের জন্য খাছ করেছেন। কারণ ছিয়াম আল্লাহর কাছে একটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। ছিয়ামকে আল্লাহ ভালোবাসেন। ছিয়ামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি ইখলাছ প্রকাশ পায়। কারণ এটা বান্দা ও তার রবের মাঝে এমন এক গোপন ভেদ যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানতে পারে না। কেননা, ছিয়াম পালনকারী ইচ্ছা করলে মানবশূন্য জায়গা বা এলাকায় আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু আহার করতে পারেন কিন্তু তিনি তা করেন না। কারণ তিনি জানেন তার একজন রব রয়েছেন, যিনি নির্জনেও তার অবস্থা জানেন। আর তিনিই তার ওপর এটা হারাম করেছেন। তাই তিনি ছিয়ামের ছওয়াব লাভের আশায় এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার ভয়ে আহার পরিত্যাগ করেন।

এজন্যই আল্লাহ ছিয়াম পালনকারী বান্দার এই ইখলাছের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে ছিয়ামকে সকল ইবাদত থেকে নিজের জন্য বিশিষ্ট করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও ছওয়াবের জন্য রাযামানের ছিয়াম রাখার তাওফীক্ব দান করুন। আমাদের ছিয়াম-সাধনাকে তিনি কবুল করুন। এর ত্রুটি ও অপরাধগুলো ক্ষমা করুন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত সাফল্য আমাদের দান করুন- আমীন!

(বিজ্ঞাপন- মৌচাক মধু 'কলামের এক-চতুর্থাংশ' পৃষ্ঠা)

---

১০. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯০৮, আহমাদ, হা/২০২৫; ইবনু মাজাহ, হা/২৯৯১।

১১. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

১২. ইবনু মাজাহ, হা/৩৮২৩।

১৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৬২৬।

নারীদের ছিয়ামের বিধান

-অধ্যাপক ওবায়দুল বারী বিন সিরাজউদ্দীন*

ছিয়াম সাধনার মাস রামাযান। শব্দটি আরবী- رمض 'রময' ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ- দহন করা, ঝলসে দেওয়া, জ্বালিয়ে দেওয়া। রামাযানে দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম পালনের মাধ্যমে ছিয়াম সাধকের সকল পাপ-পঙ্কিলতা, গুনাহ-খাতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আত্মার কালিমা মুছে যায়। মুমিনের হৃদয়ে ঔজ্জ্বল্য আসে। তাই ছিয়াম সাধনার এ মাসটির নাম রামাযান বলা হয়েছে।

আরবী صوم 'ছওম' শব্দ থেকে ছিয়াম শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ- বিরত থাকা। শারঈ পরিভাষায়, ছুবহে ছাদিক্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যত সহকারে কোনো ধরনের পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে ছিয়াম বলা হয়।

মহান আল্লাহ ছিয়াম বান্দার ফরয করেছেন, পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। অবশ্যই এর মাধ্যমে তোমরা তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে পারবে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৩)*।

নারীর উপর ছিয়াম কখন ফরয হয় :

একজন কিশোরীর মাঝে সাবালিকা হওয়ার কোনো নিদর্শন স্পষ্ট হলে সে প্রাপ্তবয়স্কা হিসাবে গণ্য হয় এবং তখন থেকে তার উপর আল্লাহ প্রদত্ত ফরয বিধানগুলো কার্যকর হয়। সুতরাং কিশোরী প্রাপ্তবয়স্কা হলে তার উপর ছিয়াম ফরয হয়ে যায়। নারীদের সাবালিকা হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হায়েয তথা ঋতু আরম্ভ হওয়া। একজন কিশোরীর ঋতু কখনো নয় বছরেই আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু সে নিজেকে অপ্রাপ্তবয়স্কা ছোট ধারণা করে ছিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকে। আর তার পরিবারও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। যার ফলে সে থাকে উদাসীন। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয বিধান সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করা নিতান্ত অন্যায়। কারো ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে গেলে ঋতু আরম্ভের পর থেকে যে ছিয়ামগুলো ছুটে গিয়ে ছিল তা পরবর্তীতে ক্বাযা করতে হবে।

নারীদের ছিয়ামের মাসআলা :

(১) হায়েয ও নিফাসের সময় নারীদের ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে, পরবর্তীতে তা ক্বাযা করা ওয়াজিব। এ মর্মে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ 'আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো; কিন্তু ছালাত ক্বাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না'।[১]

(২) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর জন্য শারঈ কোনো কারণ ছাড়া ছিয়াম পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। যেমন- ছিয়াম রাখার কারণে শিশুর দুধের ঘাটতি, গর্ভধারিণী কিংবা গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি। শারঈ কারণে তারা ছিয়াম পরিত্যাগ করে থাকলে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায় করবে।[২] তারা চাইলে ফিদইয়াও প্রদান করতে পারে।[৩] আর যদি কেউ রামাযান মাসে সফরের কারণে অথবা অস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ছিয়াম রাখতে অক্ষম হয় তাহলে সে পানাহার করবে এবং ছুটে যাওয়া ছিয়াম সুস্থতার পরে ক্বাযা আদায় করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 'কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে ছিয়াম পালন করে আর যে পীড়িত কিংবা সফরে আছে, সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করবে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। আর যদি এমন কোনো স্থায়ী রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ছিয়াম রাখতে পারছে না যা থেকে সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভবনা নেই, তাহলে সে ব্যক্তি ফিদইয়া হিসেবে প্রতি ছিয়ামের জন্য একজন মিসকীনকে আধা ছা' (সোয়া কেজি) খাদ্যদ্রব্য প্রদান করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 'আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদইয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৫)*। গর্ভধারিণী এবং দুগ্ধদানকারী নারী অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায়। সুতরাং গর্ভজাত, দুগ্ধপোষ্য সন্তানের স্বাস্থ্যহানি বা দুগ্ধদানকারী নারীর ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে পরবর্তীতে ছুটে যাওয়া ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। অথবা সে ফিদইয়া হিসেবে মিসকীনকে আধা ছা' খাদ্য প্রদান করবে। যদিও এই দুই শ্রেণির নারীর ফিদইয়া দেওয়ার বিষয়টি মতানৈক্যপূর্ণ।

সন্তানের কিংবা নিজের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় ছিয়াম পরিত্যাগকারিণী নারীর ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার হুকুম সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, গর্ভবতী নারীর দুটি অবস্থার কোনো একটি হতে পারে :

---

* পি.এইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৫; তিরমিযী, হা/১৩০; নাসাঈ, হা/২৩১৮; আবূ দাঊদ, হা/২৬২।

২. আল-বাক্বারা, ২/১৮৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃ. ৫৯০।

৩. আবূ দাঊদ, হা/২৩১৮।

(১) হয়ত সে শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও কর্মোদ্যমী। যার কারণে ছিয়াম রাখতে কষ্ট হয় না এবং গর্ভস্থিত সন্তানের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না- এ নারীর উপর ছিয়াম রাখা ফরয। যেহেতু ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার জন্য তার কোনো শারঈ কারণ নেই।

(২) গর্ভধারণের কাঠিন্যের কারণে অথবা তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যে কোনো কারণে। এ অবস্থায় এ নারী ছিয়াম রাখবে না। বিশেষত, যদি তার গর্ভস্থিত সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে সেক্ষেত্রে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া তার উপর ফরয। যদি সে ছিয়াম ছেড়ে দেয় তাহলে অন্য ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে হুকুম তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এ ছিয়ামগুলো ক্বাযা পালন করা তার উপর ফরয। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার পর এ ছিয়ামগুলো ক্বাযা পালন করা তার উপর ফরয। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণের ওযর থেকে সে মুক্ত হয়েছে ঠিক; কিন্তু নতুন একটি ওযরগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অর্থাৎ দুগ্ধপান করানোর ওযর। দুগ্ধদানকারী নারী পানাহার করার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়তে পারে। বিশেষত, গ্রীষ্মের দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর জন্য ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা সে নারীকে বলব, আপনি ছিয়াম ছেড়ে দিন। এ ওযর দূর হওয়ার পর আপনি এ ছিয়ামগুলো ক্বাযা আদায়া করবেন।[৪]

ছিয়ামের মাসআলায় নারীদের জন্য কয়েকটি জ্ঞাতব্য :

(১) যে নারীর হায়েয শেষ হওয়ার পরও কোনো কারণে রক্ত নির্গত হয়, তাকে মুস্তাহাযা নারী বলে। তার উপর ছিয়াম রাখা জরুরী। ইস্তেহাযার কারণে ছিয়াম পরিত্যাগ করা তার পক্ষে বৈধ নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ ঋতুমতী নারীর পানাহার করার আলোচনা শেষে বলেন, ইস্তেহাযা এর বিপরীত। কারণ ইস্তেহাযা দীর্ঘ সময় ধরে থাকে; তার এমন কোনো সময় নেই যেখানে তাকে ছিয়ামের নির্দেশ দেওয়া হবে। আবার ইস্তেহাযা থেকে তার বাঁচারও উপায় নেই। ইস্তেহাযার রক্ত হচ্ছে সামান্য বমি, আঘাতের কারণে বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত বের হওয়া কিংবা স্বপ্নদোষ ইত্যাদির মতো, যার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই; যার থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। অতএব, এটা হায়েযের রক্তের মতো ছিয়ামের পথে বাঁধা নয়।[৫]

(২) ঋতমতী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী যদি শারঈ কারণে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং ক্বাযা করার নিয়্যতে ফিদইয়া না দিয়ে থাকে, তাহলে রামাযান পরে ওযর চলে গেলে তা যত দ্রুত সম্ভব ক্বাযা করে দিবে। পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত তার ক্বাযা আদায় হয়নি এমনটি যেন না হয়।

(৩) স্বামী বাড়িতে থাকাবস্থায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নারীর নফল ছিয়াম রাখা জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ‘কোনো নারীর পক্ষে জায়েয নয় যে, সে তার স্বামীর উপস্থিতিতে ছিয়াম রাখবে তার অনুমতি ব্যতীত’।[৬]

অবশ্য যদি স্বামী নফল ছিয়াম রাখার সাধারণ অনুমতি দিয়ে রাখে অথবা স্বামী উপস্থিত না থাকে অথবা তার স্বামীই না থাকে, তাহলে তার পক্ষে নফল ছিয়াম রাখা ভালো। বিশেষভাবে যে দিনগুলোকে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব, যেমন— সোমবার, বৃহস্পতিবার ও প্রত্যেক মাসে তিনটি ছিয়াম, শাওয়াল মাসের ছয় ছিয়াম, জিলহজ্জ মাসের ১০ দিনের ছিয়াম, আরাফার ছিয়াম এবং আগে কিংবা পরে একদিন মিলিয়ে আশূরার দিন ছিয়াম রাখা।

(৪) ঋতুমতী নারী যদি রামাযান মাসে দিনের মধ্যবর্তী সময় পাক হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে সে অবশিষ্ট দিন বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে ক্বাযা করবে। সময়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে অবশিষ্ট দিন তার বিরত থাকা উচিত।[৭]

রামাযান মাসের জরুরী কর্তব্য :

(১) বেশি বেশি কালেমা পাঠ করা।
(২) বেশি বেশি ইস্তিগফার করা।
(৩) বেশি বেশি আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করা।
(৪) জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া।
(৫) বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা।
(৬) আল্লাহর যিকির করা ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা।
(৭) রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দরূদ পাঠ করা।
(৮) বাড়িতে কুরআন তেলাওতের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের তা‘লীম দেওয়া, ইসলামী পুস্তকাদি পাঠ করা।
(৯) ফরয ছালাতের পাশাপাশি ছালাতুত তারাবীহ/তাহাজ্জুদ আদায় করা।
(১০) সব ধরনের অনর্থক ও অন্যায়-অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। বিশেষ করে গীবত-পরনিন্দা না করা এবং টেলিভিশনে কিংবা অনলাইনে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা।
(১১) সর্বোপরি সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলগুলোকে গুরুত্ব প্রদান করা।

আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিম নর-নারীকে ছিয়ামের বিশুদ্ধ বিধানাবলি জেনে ছিয়াম সাধনার পূর্ণ ফযীলত অর্জন করা এবং উক্ত আমলগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে রামাযান মাসের বিশেষ রহমত লাভে ধন্য হয়ে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৪. শায়খ উছায়মীন, ফাতাওয়া আছ-ছিয়াম, পৃ. ১৬২।
৫. মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৫/২৫১।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০২৬; আহমাদ, ২/৩১৬, আহমাদ ও আবূ দাউদের কতক বর্ণনায় আছে, তবে রামাযান ব্যতীত।
৭. মাজমূউল ফৎওয়া ইবনু বায, ১৫/১৯৩।

যাকাত বের করার সঠিক পদ্ধতি

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম। যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এজন্য যাকাত ফরয এমন মুসলিম মাত্রই যাকাত আদায় করতে বাধ্য। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা প্রত্যেকেই যাকাত বের করতে গিয়ে নানা জটিলতার সম্মুখীন হই, যেগুলোর সঠিক উত্তর জানা না থাকলে সঠিকভাবে ও যথোপযুক্ত উপায়ে যাকাতের হিসাব বের করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই যাকাত বের করার সঠিক পদ্ধতি জানার কোনো বিকল্প নেই। আলোচ্য প্রবন্ধটি আল-ইতিছাম টিভিতে প্রকাশিত একটি বক্তব্যের পরিমার্জিত লিখিত রূপ। উক্ত প্রবন্ধে সহজ ও বোধগম্য ভাষায় যাকাতের হিসাব বের করার সঠিক উপায় পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। *ওমা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।*

উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে শুধু ধন-সম্পদের যাকাতের হিসাব উল্লেখ করা হয়েছে। ফসলের ওশর এবং পশু-প্রাণীর যাকাতের হিসাব উল্লেখ করা হয়নি।

যাকাত ফরয হওয়ার মৌলিক শর্ত :

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কয়েকটি মৌলিক শর্ত রয়েছে। যথা—

(১) মুসলিম হওয়া : কোনো কাফেরের উপর যাকাত ফরয নয়। মুসলিম দেশে বসবাসকারী কাফেরগণ জিযিয়া বা কর দিবেন যার হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা। যাকাত শুধু মুসলিমদের উপর ফরয। কেননা যাকাত একটি ইবাদত যা দ্বারা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।[১] তবে কাফেররা পরকালে অবশ্যই জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে।

(২) স্বাধীন হওয়া : গোলাম বা ক্রীতদাসের উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা তারা সাধারণত সম্পদের মালিক হতে পারে না। বরং তাদের সবকিছুই অন্যের অধীন।

(৩) নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া : কোনো ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আবশ্যক।[২] স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা ৮৫ গ্রাম, যার ২২ ক্যারেটের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৪,৫০,০০০ (সাড়ে চার লক্ষ) টাকা অথবা রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বায়ান্ন ভরি বা ৫৯৫ গ্রাম, যার ২২ ক্যারেটের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা তৎসম পরিমাণ মূল্য ৪,৫০,০০০ (সাড়ে চার লক্ষ) টাকার অথবা ৫২.৫ ভরি রৌপ্য বা তৎসম পরিমাণ মূল্য ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা। টাকার মালিক হলে তার উপর যাকাত ফরয।[৩] এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরী যে, ব্যক্তি রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিবে, না-কি স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিবে— বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন। চাইলে সে রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বর্তমান বাজারে এর সমমূল্য ৪০,০০০ টাকার মালিক হলে নিজের উপর যাকাত ফরয মনে করে যাকাত বের করতে পারে। অথবা সে অপেক্ষা করতে পারে স্বর্ণের হিসাব অনুযায়ী নিজের উপর যাকাত ফরয হওয়া পর্যন্ত তথা বর্তমান বাজারে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের সমমূল্য ৪,৫০,০০০ টাকার মালিক হওয়া পর্যন্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যাকাত বের করার বিষয়ে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোনো পদ্ধতিতে যাকাত হিসাব করতে পারবে। তবে ফকীর-মিসকীনের হক্কের প্রতি লক্ষ রেখে রৌপ্যের হিসাব অনুযায়ী যাকাত বের করাই শ্রেয়।

(৪) সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া : যেদিন ব্যক্তি নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, সেদিন থেকে এক চন্দ্র বছর তাকে হিসাব করতে হবে। এর পর থেকে প্রতি বছর ওই একই তারিখে তাকে যাকাত বের করতে হবে।[৪]

বিষয়টি ঠিক তেমন, যেমন কোনো ব্যক্তি তার ব্যবসার অর্থবছর হিসাব করে এক হালখাতা থেকে আরেক হালখাতা পর্যন্ত এবং অনুষ্ঠান করে, অনুরূপভাবে যাকাত বের করার জন্য যাকাতবর্ষ হিসাব করতে হবে। আর সেটা হবে পূর্ণ এক চন্দ্রবৎসর তথা কোনো ব্যক্তি রামাযান মাসে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকে ঠিক পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তার এই নিছাব পরিমাণ সম্পদের স্থিতিকাল এক বছর অতিক্রম করছে কি-না সেটা পর্যবেক্ষণের জন্য।

যাকাতযোগ্য সম্পদ কী?

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যাকাতযোগ্য সম্পদকে চার ধরনের বস্তু দ্বারা হিসাব করা ফরয করেছেন।

(১) উৎপাদিত শস্য : জমিতে উৎপাদিত শস্য দ্বারা যাকাত দিতে হবে। আবাদি জমিতে যেসব ফসল উৎপদিত হবে,

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. সূরা আত-তওবা, ৯/৫৪; ছহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৪৭।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪; আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৯১; দারাকুৎনী, হা/১৯৯।

৪. ইবনু মাজাহ, ইরওয়াউল গালীল, হা/৭৮৭।

ঐসব ফসলের উপর ইসলাম উশর নির্ধারণ করেছে।[৫]

(২) ব্যবসায়িক সম্পদ : যেসব সম্পদের মাধ্যমে কেউ প্রতিনিয়ত অর্থ উপার্জন করছে তথা ব্যবসাবাণিজ্য করছে, ঐসব ব্যবসায়িক সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। এক কথায় বর্ধনশীল সম্পদের উপর যাকাত ফরয *(আল-বাক্বারা, ২/২৬৭)*।

(৩) সোনা-রূপা : স্বর্ণ ও রৌপ্য বা এর পরিবর্তে ব্যবহৃত পৃথিবীর যে কোনো কারেন্সি/মুদ্রা হতে পারে। যেমন- টাকা, ডলার, রিয়াল ইত্যাদি। আদান-প্রদানের জন্য স্বীকৃত এরূপ যে কোনো মুদ্রার উপর যাকাত লাগবে।[৬]

(৪) চতুষ্পদ জন্তু : হালাল চতুষ্পদ জন্তুর উপর নির্ধারিত সংখ্যার হিসাবের আলোকে যাকাত ফরয হয়ে থাকে।[৭] আমরা এই প্রবন্ধে শুধু ব্যবসায়িক সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মুদ্রা ইত্যাদির উপর কীভাবে যাকাত বের করতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। অন্য প্রবন্ধে আমরা ফসলের উশর ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাতের বিষয়টি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

যাকাতযোগ্য সম্পদের প্রকারভেদ :

আমরা যাকাতযোগ্য সম্পদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। যথা— (ক) মৌলিক যাকাতযোগ্য সম্পদ (খ) বাসাবাড়ির যেসব জিনিস যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (গ) ব্যবসাবাণিজ্যের যা যাকাতযোগ্য। (ঘ) ব্যবসাবাণিজ্যের যা যাকাতযোগ্য নয়।

(ক) মৌলিক যাকাতযোগ্য সম্পদ :

(১) ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত উভয় ধরনের স্বর্ণের উপর যাকাত ফরয। ব্যবহৃত স্বর্ণ যেগুলো ব্যক্তির স্ত্রী ও মেয়ে ব্যবহার করছে, এর যাকাত দিতে হবে। ঠিক তেমনি যে স্বর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় ব্যাংকের লকারে সুরক্ষিত আছে, ওই স্বর্ণেরও যাকাত দিতে হবে।

(২) যেকোনো নগদ ও সঞ্চিত অর্থ, যা ব্যক্তির হাতে লিকুইড বা তরল অবস্থায় আছে এই অর্থের যাকাত দিতে হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, সঞ্চয়পত্র অথবা ফিক্সড ডিপোজিটসহ ব্যাংক, বিকাশ, রকেট ও অন্য যেকোনো মাধ্যমে জমানো টাকাও যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৩) একজন ব্যক্তি অন্য কাউকে কর্য হিসাবে দিয়েছেন এমন অর্থ যা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার যাকাত দিতে হবে। যেহেতু এটা মালিকের হাতে না থাকলেও তার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত সম্পদ তাই এটাও যাকাতের মধ্যে হিসাব হবে।

(খ) বাসাবাড়ির যে সকল সম্পদ যাকাতযোগ্য নয় :

(১) ব্যবহৃত যানবাহন : ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে কেবল স্বর্ণ ও রূপার যাকাত দিতে হয়। আর বাকি যা কিছু আছে তার কোনো কিছুরই যাকাত নেই। যদি কেউ ১০টি বি.এম. ডাব্লিউ গাড়ি ব্যবহার করে তারপরও তার কোনো যাকাত নেই। কেউ যদি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঘড়ি ব্যবহার করে তাও সেই ঘড়ির যাকাত নেই। ব্যবহৃত কোনো জিনিসের যাকাত নেই।

(২) আসবাবপত্র : গৃহে ব্যবহৃত আসবাবপত্রের উপর যাকাত ফরয নয়। কারো বাড়িতে ১০-১৫টি এসি, বহু ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিনসহ আরো কত দামি দামি আসবাবপত্র থাকে। এগুলো কোনো কিছুর উপর যাকাত ধার্য করা হবে না।

(৩) বসবাসের জন্য বাড়ি : যত বড়ই বাংলো বাড়ি হোক কিংবা যত দামিই বাড়ি হোক না কেন বা কোটি টাকার ফ্লাট হোক যেটা মালিক নিজে বসবাস করার জন্য করেছে, তার উপর কোনো যাকাত নেই। এককথায় নিজের ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা কোনো কিছুর উপর যাকাত নেই। শুধু যেটা ব্যবসার জন্য বা পুনরায় বিক্রি করে লাভ করার জন্য ক্রয় করা হয়েছে, তার উপর যাকাত ফরয।

(গ) ব্যবসায় সম্পদের মধ্যে যেগুলো যাকাতযোগ্য সম্পদ :

(১) কাঁচামাল : ব্যবসায় সম্পদের মধ্যে ফ্যাক্টরির কাঁচামাল যাকাতযোগ্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ গার্মেন্টস ব্যবসা করে। গার্মেন্টসের কাঁচামাল হলো সুতা। এখন তার নিকট যে সুতা কাঁচামাল হিসাবে মজুদ আছে, তার বাজারমূল্য অনুযায়ী তাকে যাকাত বের করতে হবে। ধরুন, কেউ বইয়ের ব্যবসা করে, তার কাঁচামাল হবে কাগজ। তার গোডাউনে যত টাকার কাগজ আছে, তার নিছাব পূর্ণের দিন বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত নির্ধারিত হবে।

(২) তৈরিকৃত পণ্য : বিক্রয়যোগ্য যে কোনো পণ্য যা আপনার দোকানে আছে বা গোডাউনে আছে, তার যাকাত লাগবে। যাকাত বের করার দিনের বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত বের করতে হবে।

(৩) উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন পণ্য : সুতা থেকে কাপড় উৎপাদন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত মাঝখানে যে সমস্ত পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। এককথায় কাঁচামাল থেকে তৈরিকৃত বিক্রিয়যোগ্য পণ্য পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যের সকল সম্পদের যাকাত লাগবে।

(ঘ) ব্যবসার কাজের মাঝে যেগুলো যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয় :

(১) অফিসিয়াল আসবাবপত্র : ব্যবসার কাজে পরিচালিত অফিসের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কোনো আসবাবপত্রের যাকাত

৫. সূরা আল-আনআম, ৬/১৪১; আল-বাক্বারা, ২/২৬৭; ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩।

৬. সূরা আত-তওবা, ৯/৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৭।

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৭।

লাগবে না। যেমন— কম্পিউটার, টেবিল, চেয়ার, এসি, ফ্রিজ ইত্যাদি।

(২) যানবাহন : ব্যবসার কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও পণ্য পরিবহনের গাড়ির উপর কোনো যাকাত নেই। কোম্পানির এক হাজার গাড়ি থাকলেও ওই গাড়ির যাকাত দিতে হবে না।

(৩) মেশিনারিজ : একটি কোম্পানি উৎপাদনের জন্য যে মেশিনারিজ ব্যবহার করে, তার উপর কোনো যাকাত দিতে হবে না। এককথায় কোম্পানির যেকোনো ফিক্সড অ্যাসেট বা স্থায়ী সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য নয়।

কর্য, লোন বা ঋণ বিষয়ক :

যাকাতের হিসাবে ঋণকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) ব্যক্তির পাওনা (খ) ব্যক্তির দেনা

(ক) পাওনা বা প্রদত্ত কর্য : অন্য কেউ ঋণ নিয়েছে। মালিক তাকে কর্য দিয়েছে। এখন সে তার কাছ থেকে টাকা পাবে। এমন প্রাপ্য কর্যকে পাওনা বলে। কোনো ব্যক্তি টাকা ধার দেওয়ার পরে যদি সেটা ফেরত পাওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাহলে সেই প্রদত্ত ধারের টাকার উপর যাকাত হিসাব করতে হবে। তবে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি চাইলে উক্ত পাওনা হতে প্রতি বছর যাকাত আদায় করতে পারে। অথবা যেদিন সে তার পাওনা টাকা হাতে পাবে, সেদিন পিছনের যত বছরের বাকি যাকাত আছে সব বাকি যাকাত হিসাব করে বের করে দিবে। তবে প্রতি বছর যাকাত বের করাই উত্তম।

(খ) প্রদেয় কর্য বা দেনা : মালিক লোন নিয়েছে। তাকে কিস্তিতে বা একবারে সেই লোনের টাকা পরিশোধ করতে হবে। এটাকে দেনা বলা হয়। এই দেনার টাকা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফক্বীহগণ এই কর্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) পারিবারিক প্রয়োজনে বা জরুরী প্রয়োজনে ব্যক্তি ঋণ বা কর্য করতে বাধ্য হয়েছে।

(২) ব্যক্তির জরুরী কোনো পারিবারিক প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে প্রয়োজন অতিরিক্ত কাজের জন্য অথবা নিজের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির জন্য কর্য বা ঋণ নিয়েছে।

হুকুম : দ্বিতীয় প্রকার কর্য যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। কারণ এই ঋণ বা কর্য যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দিলে কোনো ব্যবসায়ীর উপর আর যাকাত ফরয হবে না। তার কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ বলে কিছুই বাকি থাকবে না। তখন গরীব-মিসকীনের হক্ব নষ্ট হবে। সুতরাং যাকাতের হিসাব থেকে শুধু ওই ঋণ বা কর্য বাদ যাবে, যে ঋণ বা কর্য পারিবারিক প্রয়োজনে বা জরুরী প্রয়োজনে সংগ্রহ করা হয়েছে।

যাকাতের হিসাব থেকে ঋণ বাদ দেওয়ার ধরন :

পারিবারিক প্রয়োজনে নেওয়া এই ঋণ যাকাতের হিসাব থেকে দুইভাবে বাদ দেওয়া যেতে পারে। যথা— (ক) ঋণ যদি একবারে পরিশোধযোগ্য হয়। (খ) ঋণ যদি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হয়।

যদি ঋণ এমন হয় যে কেউ ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছে এবং সে এটা একবারেই পরিশোধ করবে, তাহলে যেদিন সে যাকাত বের করবে সেই দিন ১ লক্ষ টাকা হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দিবে। আর যদি এরকম হয় যে, সে কিস্তিতে পরিশোধ করবে (অর্থাৎ মাসিক ১,০০০/= কিস্তি পরিশোধ করবে) তাহলে যেদিন সে যাকাত বের করবে, ওই দিন তার এক কিস্তি বছর বা এক যাকাত-বর্ষে যত কিস্তি হয় (এক যাকাত বর্ষ সমান ১২ কিস্তি) ১২ কিস্তি সমান ১২ হাজার টাকা বাদ দিয়ে সে বাকি টাকা যাকাতের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং সেই টাকার যাকাত আদায় করবে।

যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন দেখা যায়। যথা :

যাকাতযোগ্য সম্পদে কি পৃথক পৃথকভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া আবশ্যক?

একই শ্রেণির সব ধরনের যাকাতযোগ্য সম্পদ পৃথক পৃথকভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে বিষয়টা এমন নয়। বরং একই শ্রেণির সব যাকাতযোগ্য সম্পদ একত্রিত করে নিছাব ধরা হবে এবং নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক অবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হলে সকল যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি স্বর্ণ, ব্যাংকের টাকা, নগদ অর্থ সবকিছু একত্র করে হিসাব করে দেখল যে, সে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে। এক বছর পর পুনরায় এভাবে সকল যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাব করে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকলে সে নিজের উপর যাকাত ফরয মনে করে নিবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণকে আলাদাভাবে নিছাব পরিমাণ হতে হবে না বা আলাদাভাবে এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে না। সেক্ষেত্রে যাকাত বের করার আগের দিনও যদি কেউ সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার মালিক হয় তাহলে সেই সাড়ে ৪ লক্ষ টাকারও যাকাত লাগবে যদিও ওই সাড়ে ৪ লক্ষের উপর এক বছর অতিক্রম হয়নি। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরুরী শুধু নিছাব পরিমাণ সম্পদের উপর, সকল সম্পদের উপর নয়।

উল্লেখ্য, অবশ্যই সেই অতিরিক্ত যুক্ত হওয়া টাকা যেন ওই ব্যবসায়িক সম্পদ থেকে হয়, যার উপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একদম নতুন কোনো উৎস থেকে আসলে তা ধর্তব্য হবে না। যেমন— যাকাত বের করার আগের দিন সে তার বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারী হলে সেই সম্পদ যাকাতের হিসাবের মধ্যে আসবে না।

নিছাব একবার ছুটে গেলে কী করবে?

নিছাব একবার ছুটে গেলে পুনরায় নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে নতুন করে সেদিন থেকে নিছাবের হিসাব ধার্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত বছর রামাযানে কেউ নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলো এবং ঠিক এক বছর পর রামাযানে গিয়ে দেখল তার নিকট নিছাব পরিমাণ সম্পদ বা টাকা নেই। তাহলে তার এ বছরের নিছাব কেটে গেছে। যেহেতু তার নিছাব পরিমাণ সম্পদের এক বছর অতিক্রান্ত হলো না, সেহেতু তার নিছাব কেটে গেছে। পরবর্তীতে যখন সে নতুন করে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তখন থেকে সে আবার নতুন করে হিসাব ধরবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত। আগেরবার নিছাব পরিমাণ মালিক হওয়ার হিসাব আর নতুন হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে না। বরং পুনরায় সে যখন নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তখন থেকে আবার এক চন্দ্র বছর তাকে হিসাব করতে হবে।

বছরের মাঝে নিছাব কমে গেলে করণীয় :

বছরের মাঝে কোনো সময় নিছাবের কম-বেশি হওয়া ধর্তব্য নয়। হিসাবের তারিখে নিছাব থাকলেই চলবে। এখানে বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করা হলো। ধরুন, জানুয়ারি মাসে কেউ স্বর্ণের নিছাব অনুযায়ী সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার মালিক হলো অথবা রৌপ্যের নিছাব অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকার মালিক হলো অর্থাৎ সে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলো। এপ্রিল মাসে গিয়ে তার টাকা কমে গেল। এপ্রিল মাসে টাকা গিয়ে দাঁড়ালো স্বর্ণের দাম অনুযায়ী ২ লক্ষ টাকা এবং রৌপ্যের দাম অনুযায়ী ৩০ হাজার টাকা। তাহলে এখন তার নিকট নিছাব পরিমাণ সম্পদ নেই। জুলাই মাসে গিয়ে আরো কমে গেল। স্বর্ণের দামের হিসাব অনুযায়ী ১ লক্ষ ও রৌপ্যের দামের হিসাব অনুযায়ী ২৫ হাজার তথা সে এখন নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। অক্টোবর মাসে গিয়েও সে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়নি। আবার জানুয়ারিতে গিয়ে ঠিক গত বছর যে তারিখে নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছিল, জানুয়ারিতে গিয়ে ওই তারিখে সে তার নিকটে থাকা সম্পদ হিসাব করে দেখল স্বর্ণের দাম অনুযায়ী সাড়ে ৪ লক্ষ এবং রৌপ্যের দাম অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা আছে। তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে গেছে। নিছাবের বছরের শুরু এবং শেষে নিছাব থাকলেই যাকাত ফরয। বছরের মাঝখানে সে ফকীর হয়ে যেতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই। যেদিন নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলো, সেদিন থেকে ঠিক এক বছর পর ওই তারিখে নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে যাবে।

জমির প্লট বা ফ্লাট : জমির প্লট বা ফ্লাটের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা হলো যেগুলোকে ভাড়া দেওয়া হয় ওই সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে না। তবে ওই ভাড়ার টাকা যদি লিকুইড মানি বা নগদ অর্থ হয়ে ব্যক্তির নিকটে আসে, তাহলে যেদিন সে যাকাত বের করবে ওই দিনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যত টাকা তার নিকট নগদ হিসাবে আসবে, সেটা বাসা ভাড়া থেকে আসুক অথবা অন্য যে জায়গা থেকেই আসুক সেই টাকার উপর তাকে যাকাত দিতে হবে। জমি প্লট-ফ্লাট প্রোপারটির তখনই যাকাত দিতে হবে, যখন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়। তথা ক্রয় করা হয়েছে বিক্রয়ের জন্য। ক্রয় করার সময় নিয়্যত ছিল এটা বিক্রয় করে লাভ করা হবে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতার নিয়্যতই ধর্তব্য। নিয়্যেতের উপর বিষয়টি নির্ভরশীল। তবে ক্রয় করার সময় যদি কোনো নিয়্যত না থাকে যে বিক্রি করব, ব্যবসা করব, রেখে দেব, আবাদ করব ইত্যাদি কোনো নিয়্যত নেই এমনিতেই ক্রয় করেছে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

যদি কেউ ব্যবসা করার জন্য ক্রয় করে থাকে তথা বিক্রয় করার জন্য ফ্ল্যাট কিনেছে বা বিক্রয় করবে এই জন্য ফ্ল্যাট বানিয়েছে কিংবা বিক্রয় করবে এই জন্য সে জমি কিনেছে, তাহলে এক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ধর্তব্য নয়; বরং যাকাত বের করার সময়ের বাজারমূল্য ধর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ এক কাঠা জমি ঢাকায় কিনেছিলেন ২০০০ সালে ২ লক্ষ টাকা দিয়ে। আজকে ২০২১ সালে ঢাকার বুকে এক কাঠা জমির দাম ১ কোটি টাকা, তাহলে সে ওই জমির ১ কোটি টাকা হিসাব করবে। এক কথায় তাকে যাকাত বের করার দিনের জমির বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। প্রত্যেকটি জিনিস যা সে বিক্রয় করে লাভ করার জন্য ক্রয় করেছে (ব্যবসা করার জন্য) সেটা যেই দিন যাকাত বের করবে সেই দিনের বাজারমূল্য হিসাব করে যাকাতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত জমির যাকাত দিতে হবে না। কারণ এটা বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করা হয়নি। এটা সে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে। এর উপর তাকে যাকাত দিতে হবে না। এরকম যে কোনো জমি সে এমনিতেই ক্রয় করেছে, বিক্রয় করে লাভ করবে এমন নিয়্যতে নয়; সে জমির উপর যাকাত দিতে হবে না। যে জমিতে আবাদ করা হয় এবং তা থেকে ফসল ভোগ করা হয়, ওই জমির মূল্যের উপর কোন যাকাত দিতে হবে না। তবে আবাদি জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে।

শেয়ার বাজার বা স্টক মার্কেট : এবার আমরা দেখব শেয়ার বাজার বা স্টক মার্কেট। শেয়ার বাজার বা স্টক মার্কেটের ক্ষেত্রে শেয়ারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

(১) কোম্পানিতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মুনাফার জন্য ক্রয় করে থাকলে কোম্পানির যাকাতযোগ্য সম্পদের অনুপাতে যাকাত হিসাব করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। ধরুন, কোনো ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার

কিনেছে ১০০ টাকার। যাকাত বের করার দিন ওই কোম্পানিকে সে জিজ্ঞেস করবে, কোম্পানির যাকাতযোগ্য সম্পদ কত পার্সেন্ট। কোম্পানি তাকে জানাবে যে তার যাকাতযোগ্য সম্পদ ৩০ ভাগ। এখন সে যে ১০০ টাকার শেয়ার কিনেছে এই ১০০ টাকার ৩০ ভাগ যাকাতের জন্য হিসাব করবে তথা ১০০ টাকার ৩০ ভাগ সমান ৩০ টাকা সে তার অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যোগ করে বের করবে ।

(২) যদি সে সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয়ের ইচ্ছায় ক্রয় করে থাকে তথা প্রাইমারি মার্কেটে কোম্পানির সাথে বিজনেস করে মুনাফা ভোগ করবে এরকম নয়। বরং সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করেছে তাহলে যে দিন সে যাকাত বের করবে ওই দিন ওই শেয়ারের বাজারমূল্য কত সেটা তাকে হিসাব করে অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাবের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মাছের ঘের, বিক্রয়ের গরু, ভাড়া দেওয়া গাড়ি: এবার আমরা আরেকটি বিষয় পরিষ্কার করি, যেটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন। তা হলো— মাছের ঘের, বিক্রয়ের গরু, ভাড়া দেওয়া গাড়ি ইত্যাদি।

গরু বা খাসি লালনপালন করলে সেটার যাকাত নির্ধারিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক হিসাব রয়েছে। যেটা আমরা অন্যত্র আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তবে গরু ও খাসি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করলে যেদিন যাকাত বের করবে, সেদিনের বিক্রয়যোগ্য গরু-খাসির বাজারমূল্য অনুযায়ী যাকাত বের করতে হবে। এক্ষেত্রে গরু-খাসির নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা ধর্তব্য নয়। গরু-খাসির নির্দিষ্ট সংখ্যা শুধু স্থায়ীভাবে লালনপালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ধরা যাক, কেউ একটি গরু ক্রয় করেছে বিক্রয় করার জন্য। বিক্রয় করে লাভ করবে। তাহলে যেদিন যাকাত বের করবে ওই দিন ওই গরুর বাজারমূল্য যা সেটা যাকাতের জন্য হিসাব করতে হবে। কেননা তার ব্যবসায়িক সম্পদের মতো ওই গরুটাও তখন একটা ব্যবসায়িক সম্পদ। আর মাছের ক্ষেত্রে পুকুরে বা ঘেরে মাছ চাষ করলে কেউ যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করে এবং বিক্রয় করে সেখান থেকে ইনকাম করে, সেক্ষেত্রে তার লিজ নেওয়া পুকুরগুলো ফিক্সড অ্যাসেট বা মূল মেশিনারিজ হিসাবে গণ্য হবে। এজন্য পুকুরগুলোর দামের যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যে জিনিসটা সে আবাদ করছে তথা মাছ যেটা তার মূল ব্যবসায়িক সম্পদ, সেটার বর্তমান বাজারমূল্য অনুমান করে কত মাছ আছে, কেমন দামের মাছ আছে, সেটার উপর হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। এটাই বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত এবং উপযুক্ত মত।

রিক্সা, অটোরিক্সা, কার, মাইক্রোবাস, বাস, ট্রাক ইত্যাদি ভাড়ায় চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে কোনো যাকাত লাগবে না; যদিও তা সংখ্যায় ৫০-১০০টি বা এর চেয়ে বেশি হয়। গাড়ির দামের উপর যাকাত লাগবে না; বরং গাড়ি থেকে যে নগদ অর্থ বা লিকুইড মানিটা ব্যক্তির কাছে আসে সেই অর্থের উপর যাকাত দিতে হবে। তবে গাড়ি যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা, গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসা করে, যদি কেউ অটো রিক্সা তৈরি করে, তাহলে তার শো-রুমে যতগুলো গাড়ি আছে, যতগুলো মটরসাইকেল আছে এবং যতগুলো তৈরির প্রক্রিয়াধীন আছে, সেগুলো তার কাঁচামাল হিসাবে গণ্য হবে। এজাতীয় সবগুলোর বর্তমান বাজারমূল হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

যাকাতের ফাইনাল হিসাব :

মোটকথা, কোনো ব্যক্তি যেদিন যাকাত বের করবে, সেই দিন তার যাকাতযোগ্য যত সম্পদ আছে, সেগুলো তাকে একত্রে হিসাব করতে হবে। যেমন প্রথমত নগদ অর্থ যত আছে তা জমা করবে, ব্যবসায়িক কাঁচামাল যত আছে, দোকানে যত পণ্য আছে, সেগুলোর হিসাব করবে। স্ত্রী ও কন্যার ব্যবহৃত স্বর্ণ যত আছে, সেটা হিসাব করবে। ব্যাংকে যত টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ জমা আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডে যত জমা আছে, সঞ্চয়পত্র যত আছে, সব জমানো সম্পদ একত্রে করে দেখা গেল তার নিকট এখন ১০ লক্ষ টাকা সমমূল্যের যাকাতযোগ্য সম্পদ আছে। এই ১০ লক্ষ টাকার উপর তাকে যাকাত দিতে হবে। তবে ১০ লক্ষ টাকা থেকে যেটা বাদ যাবে, সেটা হলো কর্য বা ঋণ। এখন ব্যক্তির পরবর্তী এক বছরের জন্য ঋণের কিস্তি ধরা হলো ১ লক্ষ টাকা এবং তার এককালীন পরিশোধ করতে হবে ১ লক্ষ টাকা। এই ২ লক্ষ টাকা মোট হিসাব থেকে বাদ দিতে হবে। এখন তার নিকট নিট অর্থ থাকছে ৮ লক্ষ টাকা। এই ৮ লক্ষ টাকার ২.৫০ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হবে তথা প্রতি ১০০ টাকায় ২.৫০ টাকা। প্রতি ১ হাজার টাকায় ২৫ টাকা। প্রতি ১ লক্ষ টাকায় ২ হাজার ৫০০ টাকা। এক কথায় যাকাতযোগ্য সম্পদের ২.৫ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকার যাকাত ২০ হাজার টাকা বের করতে হবে। যাকাতের সম্পূর্ণ অর্থকে ৪০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যা হবে, তাই হচ্ছে যাকাতের পরিমাণ। আশা করি পুরো যাকাতের বিষয়টা আপনাদের নিকটে পরিষ্কার হয়েছে।

সুধী পাঠক! যাকাত সম্পদের রক্ষাকবচ। যাকাত আদায় না করলে সম্পদের বরকত রক্ষিত হয় না। যাকাত সম্পদকে বৃদ্ধি করে। যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে। যাকাত আদায় করা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি যাকাত গ্রহণ করার মতো কেউ না থাকে তাহলে যাকাতের অর্থ ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে। তারপরও যাকাত দিতে হবে। নইলে পরকালে আমাদের জন্য ভয়ংকর বিপদ হবে। যাকাতের অর্থ বাড়িতে রাখা গোখরা সাপ রাখার চাইতেও বিষাক্ত ও ভয়ংকর। তাই আসুন, উক্ত হিসাবের আলোকে যথাযথভাবে নিজ নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করি। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ই'তিকাফের গুরুত্ব ও ফযীলত

-আব্দুল হামীদ বিন মুজিবুর রহমান*

ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ইবাদত। দাওয়াত, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-জিহাদসহ অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় থাকাকালীন সময়ে প্রতি বছর ই'তিকাফ করতেন। ই'তিকাফকারী ব্যক্তি ই'তিকাফরত অবস্থায় জাগতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যস্ততা থেকে নিজেকে আলাদা করে ঐকান্তিকভাবে মাশগূল হয়ে পড়ে আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য অর্জনের নিরন্তর সাধনায়। ই'তিকাফ ঈমান-আমল বৃদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মুখ্য সুযোগ। তাই সকলের উচিত এই মূল্যবান সুযোগ গ্রহণ করা।

ই'তিকাফের পরিচয় :

ই'তিকাফ একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো নিঃসঙ্গতা, এক স্থানে নিজেকে বন্দি করে রাখা ইত্যাদি। শারঈ পরিভাষায় ই'তিকাফ হচ্ছে— আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের নিয়্যতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা।

ই'তিকাফের বিধান :

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম-কে আদেশ করে বলেছিলেন, 'আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখো' *(আল-বাক্বারা, ২/১২৫)*। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ই'তিকাফ আল্লাহ প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান।

ই'তিকাফ করা সুন্নাত।[১] ই'তিকাফের সবচেয়ে উপযোগী সময় রামাযানের শেষ দশক। ই'তিকাফ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো মুসলিম ই'তিকাফকে সুন্নাত বলে স্বীকার করেনি এমনটি আমার জানা নেই।

ই'তিকাফের ফযীলত :

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে ই'তিকাফের ফযীলত সম্পর্কিত অনেক হাদীছ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিছু বিশুদ্ধ বর্ণনা পেশ করা হলো—

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীগণও ই'তিকাফ করতেন।[২] রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশকে গুরুত্বসহকারে ই'তিকাফ করাটাই প্রমাণ করে যে, ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রামাযানে ই'তিকাফ করতেন'।[৩] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতি রামাযানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করতেন। তবে যে বছরে ইন্তিকাল করেন সে বছর ২০ দিন ই'তিকাফ করেছেন।[৪] আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীগণ তাঁর সাথে মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।[৫]

ই'তিকাফের উপকারিতা :

ই'তিকাফ একটি উপকারী ইবাদত। ই'তিকাফকারী এক ছালাতের পর অন্য ছালাতের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আর এ অপেক্ষার অনেক উপকারিতা ও ফযীলত রয়েছে।

(১) ই'তিকাফকারী ব্যক্তি এক ওয়াক্তের ছালাতের পর অপর ওয়াক্তের ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত ছালাতের পর উক্ত স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এ বলে তার জন্য দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে রহমত দান করো। আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি ততক্ষণ ছালাতরত বলেই গণ্য হবে যতক্ষণ সে ছালাতের জন্য অপেক্ষমান থাকে'।[৬]

(২) ই'তিকাফকারী এর মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করতে থাকে। আর তার জন্য ১০ রাত জাগরণের ফলে সে লায়লাতুল ক্বদরের মহান ফযীলত পেয়ে থাকেন।

(৩) ই'তিকাফের ফলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।

(৪) ই'তিকাফের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি আসে।

(৫) বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৬) ঐকান্তিকভাবে তওবা করার সুযোগ লাভ হয়।

(৭) তাহাজ্জুদ ছালাতে অভ্যস্ত হওয়া যায়।

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. আল-মাজমূ' লিন-নবনী, ৬/৫০১।

২. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; মিশকাত, হা/২০৯৭।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৪।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০৪৪; আবূ দাঊদ, হা/২৪৬৬।

৫. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হা/৩০৭৪; মুশকিলুল আছার, হা/৪১০০।

৬. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৯৪।

(৮) সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো যায়।

এছাড়াও ই'তিকাফের মাধ্যমে আল্লাহকে খুশি করার অনেক সুযোগ অর্জন হয়। আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকা যায়। নির্জনে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে অতীত জীবনের পাপরাশির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পাওয়া যায়। তওবার সুযোগ লাভ হয়। একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার ফলে আল্লাহ বান্দার সকল পাপ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য :

(১) আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা : সকল ব্যস্ততা দূর করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করা। যার ফলে আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হয়।

(২) পাশবিক প্রবণতা এবং অহেতুক কাজ থেকে দূরে থাকা : ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ যেমন বান্দাকে অতিরিক্ত খাওয়া-পানাহার, যৌনাচারসহ প্রবৃত্তির সকল চাহিদা রক্ষা করেন, তদ্রূপ ই'তিকাফের মাধ্যমে অন্যায়-অশ্লীল, অহেতুক কথা-বার্তা, মন্দ সংস্পর্শ ও অধিক ঘুম থেকে বাঁচিয়ে ইবাদতের সুযোগ তৈরি করে দেন।

(৩) লায়লাতুল ক্বদর তালাশ করা : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শেষ দশকে লায়লাতুল ক্বদর রয়েছে, তোমরা তা তালাশ করো। ই'তিকাফকারী শেষ ১০ রাত্রি জাগরণ করার কারণে সহজেই লায়লাতুল ক্বদর পাওয়ার সুযোগ পান। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেছি এই (ক্বদর) রজনী খোঁজ করার উদ্দেশ্যে। অতঃপর ই'তিকাফ করেছি মাঝের দশকে, অতঃপর মাঝ দশক পেরিয়ে এলাম, তারপর আমাকে বলা হলো, (ক্বদর) তা শেষ দশকে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ই'তিকাফ করতে চায় সে যেন ই'তিকাফ করে। অতঃপর লোকেরা তাঁর সাথে ই'তিকাফ করলেন'।[৭]

(৪) মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়ে তোলা : ই'তিকাফকারীর মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়। যা মুমিন জীবনের একটি বড় পাওয়া।

(৫) দুনিয়া ত্যাগ ও বিলাসিতা থেকে দূরে থাকা।

(৬) ইচ্ছাশক্তি প্রবল করা এবং প্রবৃত্তিকে খারাপ অভ্যাস ও কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলা।

ই'তিকাফে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় :

রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফের নিয়্যতকারী ব্যক্তি ২১তম রাত্রির সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে। কেননা তার উদ্দেশ্য ক্বদরের রাত তালাশ করা, যা আশা করা হয়ে থাকে বিজোড় রাতগুলোতে। যার মধ্যে ২১ এর রাতও রয়েছে।[৮]

আর বের হওয়ার উত্তম সময় হচ্ছে— চাঁদ রাত্রিতে মসজিদে অবস্থান করে পরের দিন সকালে সরাসরি ঈদের মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করে বাসায় যাওয়া। তবে শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর চাইলে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাসায় চলে যেতে পারে।

ই'তিকাফের শর্তাবলি :

(১) ই'তিকাফের নিয়্যত করা।[৯]

(২) রামাযানের ই'তিকাফের জন্য ছিয়াম থাকা আবশ্যক।[১০]

(৩) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া। কেননা পাগলের কাজের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।[১১]

(৪) মুসলিম হওয়া।[১২]

(5) ই'তিকাফকারী নারী হলে হায়েয অবস্থা থেকে মুক্ত থাকা।[১৩]

(6) ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী ই'তিকাফ করতে পারে। তবে, হায়েযের রক্তজাতীয় কোনো নাপাকী যেন মসজিদকে স্পর্শ না করে তা লক্ষ রাখা।[১৪]

(7) স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*।

(8) ই'তিকাফ মসজিদে হওয়া। বাড়িতে কিংবা অন্য স্থানে ই'তিকাফ হবে না।[১৫]

ই'তিকাফকারীর জন্য নিষিদ্ধ বিষয়াবলি :

ই'তিকাফকারী পেশাব-পায়খানা, গোসল ও ওযূ ছাড়া অনর্থক কোনো কাজের জন্য মসজিদের বাহিরে গমন করতে পারবে না। তবে প্রয়োজনীয় কাজে স্বল্প সময়ের জন্য যেতে পারে।[১৬]

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো— সে কোনো রোগী দেখতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না, তার সাথে সহবাস করবে না এবং অধিক প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাবে না, ছিয়াম না রেখে ই'তিকাফ করবে না এবং জামে মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হবে না। ইমাম আবূ দাঊদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উল্লেখিত বিষয়গুলোকে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা সুন্নাত বলেছেন'।[১৭]

---

৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৭।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/২০২৫।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/১।

১০. আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩; মিশকাত, হা/২১০৬।

১১. আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. মুওয়াত্ত্বা, ১/৩১৬।

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৭।

১৫. সূরা আল-বাক্বারা, ২/১৮৭; আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩।

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৫।

১৭. আবূ দাঊদ, হা/২৪৭৩।

লায়লাতুল ক্বদরের বিধান

-সাজ্জাদ সালাদীন*

শ্রেষ্ঠতম রাত্রি হলো লায়লাতুল ক্বদর। আমরা এ ছোট্ট লেখায় মহিমান্বিত এ রাত সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

লায়লাতুল ক্বদরের নামকরণ :

লায়লাতুল ক্বদরের নামকরণ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত মত হলো, এ রাতের নাম لَيْلَةُ الْقَدْرِ (লায়লাতুল ক্বদর) রাখা হয়েছে তার সম্মান ও মর্যাদার কারণে। আর الْقَدْرِ শব্দের অর্থ التَّعْظِيم বা সম্মান ও মর্যাদাদান। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ 'তারা আল্লাহ তাআলাকে যথাযথ সম্মান করেনি' *(আল-আনআম, ৬/৯১; যুমার ৩৯/৬৭)*। এর অর্থ হলো, নিশ্চয়ই এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ায় তা সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তার গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। অথবা এ রাতে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন বলে এটি সম্মানী। অথবা এ রাতে রহমত, বরকত ও ক্ষমা অবতীর্ণ হয়। অথবা এ রাত ইবাদতের মাধ্যমে জাগরণ করা হয়।

লায়লাতুল ক্বদর নির্ধারণ :

এ রাত নির্ধারণে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে ৪০টির বেশি মত উল্লেখ করেছেন। আর এ সকল মতামত একে অপরের পরিপূরক। তবে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো, নিশ্চয়ই তা রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে হবে এবং তা স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ কখনো তা ২১তম রাতে যেতে পারে আবার কখনো ২৫তম, কখনো ২৭তম এবং কখনো ২৯তম রাতে যেতে পারে।

আর আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণিত হাদীছটি একথারই প্রমাণ বহন করে। এটাই সর্বগ্রাহ্য ও প্রাধান্যযোগ্য মত। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ এ সংক্রান্ত মতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, এ সকল মতের মধ্যে প্রাধান্য ও অগ্রগণ্য মত হলো, وَإِنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ 'নিশ্চয়ই তা শেষ দশকের বেজোড় রাতে হবে'। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ও অন্যদের বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে অধ্যায় বেঁধেছেন এভাবে,

باب تَحَرِّى لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

অর্থাৎ 'পরিচ্ছেদ: ক্বদরের রাত (রামাযানের) শেষ দশকের বেজোড় রাতে অনুসন্ধান করা'।[১] আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, '(ইমাম বুখারীর) এ অধ্যায়ে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, লায়লাতুল ক্বদর রামাযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরপর তা শেষ দশকে নির্ধারিত। অতঃপর তা বেজোড় রাতগুলোতে। তবে তা কোন রাতে তা নির্ধারিত নয়'।[২]

লায়লাতুল ক্বদরের গুরুত্ব :

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ রাতকে সকল রাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি কুরআনুল কারীমে এ রাতকে প্রশংসার সাথে উল্লেখ করে বলেন,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ - أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ - رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

'নিশ্চয় আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনিতে; (শবে ক্বদরে) আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ফয়সালা হয়। আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(আদ-দুখান, ৪৪/৩-৮)*। বরকতময় রজনি হলো লায়লাতুল ক্বদর। আল্লাহ তাআলা একে বরকতময় বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ

* এম. এ., ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৮১৩, ২০১৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৯।
২. ফাতহুল বারী, ৪/২৬০।

রাতে রয়েছে যেমন বরকত, তেমনি কল্যাণ ও তাৎপর্য। বরকতের প্রধান কারণ হলো- এ রাতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সিদ্ধান্ত লাওহে মাহফূয থেকে ফেরেশতাদের হাতে অর্পণ করা হয় বাস্তবায়নের জন্য। এ রাতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা আল-ক্বদর অবতীর্ণ করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

‘নিশ্চয় আমি এটি (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনিতে (লায়লাতুল ক্বদরে)। আর মহিমান্বিত রজনি সম্বন্ধে তুমি কী জানো? মহিমান্বিত রজনি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ওই রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হন প্রত্যেক কাজের জন্য তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময়, এই রাত ফজর উদয় পর্যন্ত’ *(আল-ক্বদর, ৯৭/১-৫)*।

এ সূরা থেকে যে বিষয়গুলো জানা গেল :

(১) এ রাত এমন এক রাত, যাতে মানবজাতির হেদায়াতের আলোকবর্তিকা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

(২) এ রজনি হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(৩) এ রাতে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে থাকেন।

(৪) এ রজনি শান্তির রজনি। আল্লাহর বান্দাগণ এ রাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি অর্জন করে থাকে।

(৫) সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। এ আয়াতগুলোতে অল্প সময়ে বেশি কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। যত সময় বেশি, তত বেশি কাজ করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না।

(৬) গুনাহ ও পাপ থেকে ক্ষমা লাভ। এ রাতের এই ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ‘যে ব্যক্তি ঈমান ও ছওয়াব লাভের আশায় ক্বদরের রাতে নফল ছালাত আদায় ও রাত জেগে ইবাদত করবে, আল্লাহ তার পূর্বের সকল (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’।[৩]

শবে ক্বদর কি শুধু রামাযানের ২৭তম রাতের জন্য নির্দিষ্ট?

আমাদের দেশে সাধারণত মানুষ শুধু রামাযানের ২৭ তারিখে রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করে এবং ধারণা করে, এ রাতেই শবে ক্বদর অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ ধারণা সুন্নাতের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কথা শেষ দশকে বেজোড় রাতে সন্ধান করো। তার প্রথম রাত হলো ২১ তারিখ, আর সর্বশেষ হলো ২৯ তারিখ। বছরের ভিন্নতায় শেষ দশকের বিভিন্ন রাতে তা হতে পারে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْتَمِسُوْهَا يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ تِسْعٍ يَبْقِيْنَ أَو فِيْ سَبْعٍ يَبْقِيْنَ أَو فِيْ خَمْسٍ يَبْقِيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ.

আবূ বাকরা রাযিয়াল্লা-হু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা লায়লাতুল ক্বদরকে (রামাযান মাসের) অবশিষ্ট নবম রাতে, অর্থাৎ- ২৯তম রাতে; অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে, অর্থাৎ- ২৭তম রাতে; অথবা অবশিষ্ট পঞ্চম রাতে, অর্থাৎ ২৫তম রাতে; অথবা অবশিষ্ট তৃতীয় রাতে, অর্থাৎ- ২৩তম রাতে; অথবা শেষ রাতে খোঁজ করো।[৪]

সুতরাং শুধু ২৭ রামাযান নয়, বরং শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর খোঁজার জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বরং পুরো শেষ দশক ইবাদতে মশগুল থেকে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করতে হবে, যেমনটি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহে ওয়াসাল্লাম করতেন।

লায়লাতুল ক্বদর’-এ কী কী ইবাদত করবেন?

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা আমাদের বলে দিয়েছেন যে, এই রাত এক হাজার মাসের থেকেও উত্তম। অর্থাৎ এই এক রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের থেকেও উত্তম।[৫] তাই

---

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

৪. তিরমিযী, হা/৭৯৪; মিশকাত, হা/২০৯২, হাদীছ ছহীহ।

৫. আল-ক্বদর, ৯৭/৩; আল-মিছবাহ আল-মুনীর, পৃ. ১৫২১।

এই রাতটি ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করাই হবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, জানা দরকার যে ইবাদত কাকে বলে? ইবাদত হচ্ছে, প্রত্যেক এমন আন্তরিক ও বাহ্যিক কথা ও কাজ, যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকেন।[৬] এই সংজ্ঞার আলোকে বলা যেতে পারে যে, ইবাদত বিশেষ ১/২টি কাজে সীমাবদ্ধ নয়। তাই আমরা একাধিক ইবাদতের মাধ্যমে এই রাতটি অতিবাহিত করতে পারি। নিম্নে কিছু উৎকৃষ্ট ইবাদত উল্লেখ করা হলো :

১. ফরয ছালাতসমূহ ঠিক সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করা : এর সাথে সাথে সুন্নাতে মুআক্কাদা, তাহিয়্যাতুল মাসজিদসহ অন্যান্য মাসনূন ছালাত আদায় করা।

২. তারাবীহর ছালাত করা : অর্থাৎ রাতে তারাবীহর ছালাত আদায় করা। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমান ও নেকীর আশায় লায়লাতুল ক্বদরে ক্বিয়াম করবে (ছালাত পড়বে), তার বিগত গুনাহ ক্ষমা করা হবে'।[৭]

৩. বেশি বেশি দু'আ করা : আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَوْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِي فِيهَا أَنْ أَسْأَلَ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ 'যদি আমি লায়লাতুল ক্বদরের রাত জানতে পারি, তাহলে আমার অধিক দু'আ হবে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা চাওয়া'।[৮] ফলে সেই দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করা উচিত, যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে শিখিয়েছিলেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি লায়লাতুল ক্বদর লাভ করি, তাহলে কী দু'আ করব? তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি বলবে, اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা পছন্দ করো, তাই আমাকে ক্ষমা করো'।[৯]

৪. যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীল করা : অবশ্য এগুলো দু'আরই অংশ বিশেষ। কিন্তু বিশেষ করে সেই শব্দ ও বাক্যসমূহকে যিকির বলে, যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করা হয়। যেমন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ইত্যাদি।

৫. কুরআন তেলাওয়াত : কুরআন পাঠ একটি বাচনিক ইবাদত, যা দীর্ঘ সময় ধরে করা যেতে পারে। যার এক একটি অক্ষর পাঠে রয়েছে এক একটি নেকী। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পড়বে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকী পাবে। আর একটি নেকী হয় তার ১০ গুণ। আমি একথা বলছি না যে, আলিফ, লাম ও মীম একটি অক্ষর; বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর'।[১০] এছাড়া কুরআন যদি কিয়ামত দিবসে আপনার সুপারিশকারী হয়, তাহলে কতই না সৌভাগ্যের বিষয়! নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা কুরআন পড়ো; কারণ সে কিয়ামত দিবসে পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে'।[১১]

অল্প কয়দিনের ইবাদতে বহু বছরের নেকী কামাইয়ের এই সুবর্ণ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

(বিজ্ঞাপন- মাসবুকের বিধি-বিধান 'এক-চতুর্থাংশ' পৃষ্ঠা)

৬. মাজমূউ ফাতাওয়া, ১০/১৪৯।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০।

৮. নাসাঈ, সুনানে কুবরা, হা/১০৬৪৮; আমালুল ইয়াওম ওয়াল লায়লাহ, হা/৮৭৮।

৯. তিরমিযী, হা/৩৫১৩; মুসনাদ আহমদ, ২৫৭৪১, হাদীছ ছহীহ।

১০. তিরমিযী, হা/২৯১০, হাদীছ ছহীহ।

১১. ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৪।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

মৃত মুসলিমদের জন্য নিবেদিত আমলসমূহের প্রতিদান

মূল : ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী রাহিমাহুল্লাহ
*অনুবাদ : হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন**

(ফেব্রুয়ারি'২২ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

(পর্ব-৩)

৭ম দলীল : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা উহুদযুদ্ধে শহীদ হন। আর তিনি ছয়টি কন্যা সন্তান রেখে যান এবং তাঁর উপর ঋণও রেখে যান [৩০ ওয়াসাক্ব]। [ঋণদাতারা তাদের ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর হয়ে পড়ল]। খেজুর কাটার সময় হলে আমি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি জানেন যে, আমার পিতা উহুদযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর তিনি তার কাঁধে অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার মন চায় যে, পাওনাদাররা আপনার সাথে দেখা করুক। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক এক রকম খেজুর এক এক স্থানে জমা করো। আমি তাই করলাম। অতঃপর তাঁকে আহ্বান করলাম। [সকাল হলে তিনি আমাদের কাছে আসলেন] পাওনাদাররা যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা আমার নিকট জোর তাগাদা করতে লাগল। তিনি তাদের এরূপ করতে দেখে খেজুরের বড় স্তূপটির চারদিকে তিন বার ঘুরলেন [এবং তিনি ফলমূলের বরকতের জন্য দু'আ করলেন]। অতঃপর তার উপর বসে পড়লেন। অতঃপর বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাকো। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলেন'।[১] তার পিতার অছিয়ত ছিল যে, তারা তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে। আর আল্লাহর কসম! আমার পিতার ঋণ আল্লাহ পরিশোধ করার পর যদি আমি আমার বোনদের নিকট একটি খেজুরও না নিয়ে ফিরি, তাতেও আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু আল্লাহর কসম! সমস্ত স্তূপই যেমন ছিল তেমন রয়ে গেল। আমি সেই স্তূপটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিলাম, যার উপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন। মনে হলো যে, তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি। [অতঃপর আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম এবং তাঁকে ওই ঘটনাটি বললাম, তখন তিনি হাসলেন অতঃপর বললেন, আবূ বকর ও উমারের কাছে যাও এবং দু'জনের কাছে খবরটা দাও। তাঁরা বললেন, আমরা আগেই জানতাম যে, যখন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করার তা যেহেতু করেছেন, তখন অবশ্যই এ রকমই হবে]'।[২]

৮ম দলীল : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও যথার্থ গুণগান গাইতেন। আর বলতেন,

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ.وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يقول صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً أَوْ دَيْناً فَعَلَىَّ وَإِلَىَّ وَأَنَا وَلِىُّ الْمُؤْمِنِينَ وفي رواية: بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ.

'আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হেদায়াতকারী কেউ নেই। সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব। সর্বোৎকৃষ্ট দিক-নির্দেশনা হলো মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক-নির্দেশনা। সর্বনিকৃষ্ট কর্ম হলো নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত কর্ম হলো বিদআত। [প্রত্যেক বিদআত হলো ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে]। ক্বিয়ামত সম্পর্কে তিনি আলোচনা করলে তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত, আওআজ বুলন্দ হয়ে যেত, রাগ কঠিন হয়ে যেত। যেন তিনি সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করে বলছেন- সকাল এবং সন্ধ্যায় তোমাদেরকে শত্রু আক্রমণ করবে, যে ধনসম্পদ রেখে

---

* নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

১. তার পিতার অছিয়ত ছিল যে, তারা তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে।

২. ছহীহ বুখারী, 'বিবাদ-মীমাংসা' অধ্যায়, 'পাওনাদারদের মধ্যে এবং ওয়ারিছদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে অনুমান করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৭০৯, ২৭৮১; আবূ দাঊদ অনুরূপ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'ঋণগ্রস্ত মৃতের ঋণ পরিশোধে ওয়ারিছদের সময় দেওয়া ও সদয় হওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/২৮৮৪; নাসাঈ, 'অছিয়ত' অধ্যায়, 'সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত প্রসঙ্গে' অনুচ্ছেদ, হা/৩৬৬৬; ইবনু মাজাহ, 'বিচার ও বিধান' অধ্যায়, 'মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৪৩৪; বায়হাক্বী, ৬/৬৪; মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩১৩, ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৯১, ৩৯৭, বিশদভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছে ইমাম আহমাদের নিকটে অনেক অতিরিক্ত রয়েছে, যা আমি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে উল্লেখ করিনি।

যাবে, তা তার ওয়ারিছদের জন্য হবে। আর যে নিঃস্ব পরিবার[৩] অথবা ঋণ রেখে যাবে, তাদের (দেখাশুনা করার) দায়িত্ব এবং ঋণ (পরিশোধ করার) দায়িত্ব আমার হবে। আমি (ঋণ পরিশোধ বা দায়িত্ব গ্রহণে) মুমিনদের অধিক নিকটতর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি প্রত্যেক মুমিনের অধিক নিকটতর তার স্বীয় জান থেকে'।[৪]

৯ম দলীল : আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ 'আমার উম্মতের মাঝে যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে পরিশোধ করার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিশোধ করতে পারল না, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, তার (ঋণ পরিশোধে) আমি তার অভিভাবক'।[৫]

১০ম দলীল : মানুষ মারা যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব, তত দ্রুত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যদি মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার মতো ধনসম্পদ না থাকে, তাহলে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের উপর বর্তাবে। রাষ্ট্রপ্রধানও যদি পরিশোধ না করে, তাহলে উপস্থিতিদের মধ্যে কেউ পরিশোধ করলে হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে,

كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

'রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যদি মৃত দেহ (জানাযার জন্য) আসত যার উপর ঋণ থাকত, তবে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি তার ঋণ পরিশোধের জন্য ওই পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে, যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ হতে পারে? যদি জানানো হতো যে, সে ঋণ পূর্ণ করার পরিমাণ সম্পদ রেখে গেছে, তবে তিনি তার জানাযা পড়তেন। অন্যথা বলতেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো। যখন আল্লাহ তাঁর জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় এনে দেন, তখন তিনি বলেন, আমি মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী। সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণ অবস্থায় মারা যাবে, তার সে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য'।[৬]

১১তম দলীল : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ 'ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[৭]

১২তম দলীল : মৃত ব্যক্তির করে যাওয়া অছিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে। কমপক্ষে রেখে যাওয়া ধনসম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। কেননা অছিয়ত বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। আর দ্রুত অছিয়ত পালন করা (অবস্থার পরিপেক্ষিতে) হতে পারে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব। অছিয়ত ওয়াজিব বিষয়ের ক্ষেত্রে হলে যিম্মা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দ্রুত অছিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে। আর নফল বিষয়ের অছিয়ত হলে, (মৃত ব্যক্তির) ছওয়াবের (প্রয়োজনীয়তার) কারণে দ্রুত অছিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে। অছিয়ত হতে পারে ওয়াজিব অথবা হতে পারে মুস্তাহাব। উলামায়ে কেরাম বলেন, فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن 'দাফন করার পূর্বে অছিয়ত বাস্তবায়ন করা উচিত'।[৮] আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 'মুমিন ব্যক্তির রূহ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে'।[৯]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ 'যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তাআলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করেন'।[১০]

(চলবে)

৩. আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অর্থাৎ পরিবার-পরিজন। ইবনুল আছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যা 'নষ্ট হয়েছে, নষ্ট হবে, নষ্ট হওয়া' এ রূপান্তিত হয়েছে। তাই মাছদারের কারণে 'যআ' শব্দটি 'ইয়াল' বা পরিবার বলা হয়। যেমনভাবে তুমি বলে থাকো, من مات وترك فقراً أي فقراء 'যে মৃতুবরণ করল, অথাৎ সে দরিদ্র রেখে গেল।

৪. ছহীহ মুসলিম, 'জুমআ' অধ্যায়, 'জুমআর ছালাত এবং খুৎবা হালকা করা' অনুচ্ছেদ, হা/৮৬৭; সুনানে বায়হাক্বী ৩/২১৩, ২১৪; আসমা ওয়াছ ছিফাত, পৃ. ৮২; মুসনাদে আহমাদ, ৩/২৯৬-৩১০, ৩৩৮, ৩৭১, বর্ণনার ধারাবাহিকতা ইমাম আহমাদের; আবূ নুআঈম, হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮৯, 'আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম বৃদ্ধি অংশটুকু ছিল আবূ নুআইমের। আর নাসাঈ এবং বায়হাক্বী উভয়ের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ। আর দ্বিতীয় বৃদ্ধি অংশটুকু নাসাঈ এবং বায়হাক্বীর ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ বৃদ্ধি অংশটুকু ছিল ইমাম আহমাদের। ইমাম মুসলিমের ছিল দ্বিতীয় বর্ণনাটি।

৫. মুসনাদে আহমাদ, ৬/৭৪, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীছটির সনদ ছহীহ; হাফেয মুনযিরী বলেন, ৩/৩৩; (আহমাদের বর্ণনায় সনদ উত্তম এবং আবূ ইয়া'লা ও ত্বাবারানী মু'জামুল আওসাত্ব); অনুরূপ মাজমূ', ৪/১৩২; তবে তিনি বলেন, ইমাম আহমাদের হাদীছটির বর্ণনাকারীরা বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী; আর ফাতহুল বারী, ৫/৫৪-এ এই মাসআলা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক আলোচনা সংযোজন করা হয়েছে।

৬. ছহীহ বুখারী, 'যামিন হওয়া' অধ্যায়, 'ঋণ' অনুচ্ছেদ, হা/২২৯৮; ছহীহ মুসলিম, 'ফারায়েয' অধ্যায়, 'যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যাবে তা তার উত্তরাধিকারীগণ পাবে' অনুচ্ছেদ, হা/১৬১৯ (৪০৪৯)।

৭. ছহীহ মুসলিম, 'নেতৃত্ব' অধ্যায়, 'ঋণ ব্যতীত শহীদদের সকল গুনাহ ক্ষমা' অনুচ্ছেদ, হা/১৮৮৬; মিশকাত, হা/২৯১২।

৮. উছায়মীন, শরহুল মুমতে', ৫/৩৩২।

৯. মুসনাদে আহমাদ, ২/৪৪০; তিরমিযী, 'জানাযা' অধ্যায়, 'রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে' অনুচ্ছেদ, হা/১০৭৮, ১০৭৯; ইবনু মাজাহ, 'বিচার ও বিধান' অধ্যায়, 'ঋণের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি' অনুচ্ছেদ, হা/২৪১৩, আলবানী রাহিমাহুল্লাহ তিরমিযী, ১/৫৪৭-তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

১০. ছহীহ বুখারী, হা/২৩৮৭; মিশকাত, হা/২৯১০।

উত্তম ও সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদন করা সাফল্য ও সন্তুষ্টির পথ

*-অনুবাদ : মাহবূবুর রহমান মাদানী**

*[১৭ রজব, ১৪৪৩ হি. মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আব্দুল বারী আছ-ছুবায়তী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক **শায়খ মাহবূবুর রহমান মাদানী**। খুৎবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে নিয়ে এসেছেন। মহান পূত-পবিত্র আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা করছি, তিনি ঈমানের দ্বারা আমাদেরকে অধিকারী করেছেন সমৃদ্ধি ও আনন্দের। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক; তাঁর কোনো শরীক নেই। যিনি বলেন, ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ 'পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। যিনি উৎসাহ দিয়েছেন আনুগত্য ও গৃহীত আমলের প্রতি। কিয়ামত পর্যন্ত দরূদ বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর ছাহাবীগণের প্রতি।

অতঃপর, আমি আপনাদের সকলকে সেই সাথে নিজেকেও আল্লাহভীরুতার উপদেশ দিচ্ছি, আর তা হচ্ছে দুনিয়া ও পরকালে মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মৃত্যুবরণ করো না' *(আলে ইমরান, ৩/১০২)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ 'যে উত্তমভাবে কাজ করে আমি তার কর্মফল বিনষ্ট করি না' *(আল-কাহফ, ১৮/৩০)*। এই আয়াত মুমিনদের অন্তনসমূহকে পবিত্র করছে ও তাদের সুসংবাদ প্রদান করছে। মুমিনগণ আল্লাহর দেওয়া ওয়াদাকে সত্য প্রতিপন্ন করে। এই আয়াত মুসলিমকে তার কর্মে পর্যালোচনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম চাই আমলের সুন্দর ও সেরাটাই। যে ব্যক্তি তার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে, একনিষ্ঠতা উপস্থিত করে এবং নিপুণভাবে কাজ সম্পাদন করে যাতে সে দুনিয়া ও পরকালের আমলে সুন্দরতম অবস্থায় পৌঁছে। ফলে তার রবের নিকট তার উন্নত মর্যাদা রয়েছে। তার রব তাকে সম্মানিত করবেন তাঁর ভালবাসা, সাহায্য ও অনুগ্রহ দিয়ে।

ইহসান অর্থ— রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহসানের অর্থ বর্ণনা করেন, আপনি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আপনি যদি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে মনে করবেন যে, নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন।[১] আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, আমাদের প্রত্যেক কাজেই ইহসান অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ 'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান বা দয়া-অনুগ্রহ অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন যবেহ করবে তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে'।[২] আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন; ছালাতে, ছিয়ামে, হজ্জে, ওযূতে, ছাদাক্বাতে এবং প্রত্যেক প্রকার কর্মে। যদি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে মনে করবেন যে, নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন। অর্থাৎ উক্ত বৈশিষ্ট্যের উপর যদি আপনি ইবাদত না করেন, তাহলে আপনি তাঁর ইবাদত করুন নজরদারি ও ভয়-ভীতির পন্থায়। এই অর্থ যদি অন্তরে মযবূত হয় এবং অন্তর তাকে সতর্ক করে, তখন তা চরিত্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং কর্মের বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার উপর উৎসাহ দেয়, যার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আর তা তখনই হবে যখন একনিষ্ঠতার বাস্তবায়ন করবে এবং আল্লাহর পর্যবেক্ষণ জাগ্রত হবে মুসলিমের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে; চাই তা ইবাদত, পারস্পরিক সম্পর্কে ও লেনদেনে হোক।

'আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। যদি তাঁকে দেখতে না পান তাহলে মনে করবেন যে, নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন'। এই অর্থ একজন শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মকর্তার মনকে জাগ্রত করে দেয়। সমাজে অন্যায়, দুর্নীতি এবং কাজে ফাঁকির যা কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা একমাত্র কর্মে সঠিক ও সুদক্ষতার দুর্বলতার কারণেই। কুরআন আল্লাহর ইহসানের নমুনায় বা দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, যে সুন্দরভাবে কাজ সম্পাদন করে তার জন্য । যাতে করে উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদনকারী দেখতে পায় আসমান-যমীনের মহান রবের পক্ষ হতে ইহসানের প্রভাব ও বড় প্রতিদান। আর কীভাবে ইহসানকারীর ইহসান নষ্ট হবে, অথচ সে মহান সম্মানিত আল্লাহর বানী শুনতে থাকে, ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ 'ইহসানের প্রতিদান ইহসান ছাড়া আর কী হতে পার?' *(আর-*

১. ছহীহ বুখারী, হা/৫০।
২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯৫৫।

রহমান, ৫৫/৬০)। যিনি বলেন, ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ ‘যারা উত্তমরূপে আমল করে তাদের জন্য আছে জান্নাত এবং আরও বেশি’ *(ইউনুস ১০/২৬)*।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতার সহিত সদ্ব্যবহার উপদেশ ও শিক্ষাদান হিসেবে উত্তমরূপে সম্পাদন করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ তার জন্য উক্ত ইহসান তার সন্তানদের তার সহিত সদ্ব্যবহার সংরক্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে ইহসানের বদলায় ইহসানের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ ‘স্মরণ করুন! যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! আপনি তাঁর ইবাদত করেন কেন, যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোনো কাজেই আসে না? *(মারইয়াম, ১৯/৪২)*। হে আমার পিতা! এটা চরম নম্রতা, নমনীয়তা ও আদব বহন করে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সম্মানিত করলেন তার সন্তানদের সদ্ব্যহারের দ্বারা। মহান আল্লাহ যখন তাকে নির্দেশ দিলেন তার পুত্রকে যবেহ করতে তখন তার পুত্র আল্লাহর আদেশের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন এবং তার পিতার আনুগত্য ও কথা মান্য করতে তিনি বললেন, ‘হে আমার পিতা! আপনি যা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন’ *(আছ-ছফফাত, ৩৭/১০২)*। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার সৌন্দর্যের নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা পবিত্রতা ও আমানাতের সহিত সুন্দরভাবে আদায় করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর সুন্দর কাজের হেফাযত করেছেন নবুঅত, নেতৃত্ব ও সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ‘এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। দেশের যেখানে ইচ্ছে সে নিজের স্থান করে নিতে পারত, আমি যাকে চাই আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি, আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল কক্ষনো বিনষ্ট করি না’ *(ইউসুফ, ১২/৫৬)*। আল্লাহর নবী আইয়ূব আলাইহিস সালাম কঠিন বিপদের সময় দীর্ঘ সময় ধরে সুন্দরভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অফুরন্ত কল্যাণ দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীল। কতই উত্তম বান্দা তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী’ *(ছোয়াদ, ৩৮/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, ‘অতঃপর আমরা তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং আরও দিলাম তাদের সঙ্গে তাদের সমপরিমাণ; আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ’ *(আম্বিয়া, ২১/৮৪)*। আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর হেরা গুহায় যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম অবতরণ করেন, তিনি তাঁর বিবি খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, আমি আমার নিজের নফসের উপর আশঙ্কা করছি। তখন তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আল্লাহর কসম! আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখেন, সত্য কথা বলেন, অন্যের কষ্ট লাঘব করেন, মেহমানদারী করেন এবং দুর্যোগের সময় সাহায্য করেন।[৩] অতএব, যে ব্যক্তি নিজের সমাজের, দেশের ও জনসাধারণের জন্য উত্তম ও কল্যাণময় কিছু করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কক্ষনো অপমান-অবমাননা করবেন না।

আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য উত্তমভাবে সম্পাদন করেছেন। ফলে মহান আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি শেষ নবীর বন্ধু হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।[৪]

হে আল্লাহর বান্দা! উল্লেখিত এই উদাহরণ ও দৃষ্টান্তসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবেন, যে তার কর্মে সুন্দর ও উত্তম হবে। তাই মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ‘যে উত্তমভাবে কাজ করে আমি তার কর্মফল বিনষ্ট করি না’ *(আল-কাহফ, ১৮/৩০)*। এরপর খত্বীব ছাহেব নিম্নের দু‘আ পড়ে প্রথম খুৎবা শেষ করেন।

بَارَكَ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

দ্বিতীয় খুৎবা

সম্মানিত খত্বীব দ্বিতীয় খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তার পরিবার, ছাহাবী এবং যারা তার পথে চলে তাদের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করেন। এরপর বলেন, কর্মে সঠিকতা ও ভালো করা হলো— নিজের ভালোটা নিজের জন্য করা। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ ‘তোমরা যদি ভালো কাজ করলে নিজেদের কল্যাণের জন্যই তা করবে’ *(আল-ইসরা, ১৭/০৭)*। অতএব, মুসলিমের উপর জানা কর্তব্য, তার উত্তমভাবে কাজ সম্পাদন করা হলো আল্লাহর নেয়ামত ও তাঁর কৃতজ্ঞতাকে রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ ‘তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন’ *(আল-ক্বাছাছ, ২৮/৭৭)*।

পরিশেষে সকল মুছল্লীকে সম্বোধন করে কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর দরূদ (রহমত) প্রেরণ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ করো’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*। দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করেন এবং চার খালীফার উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দু‘আ করেন। অতঃপর দেশ, জাতি ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য কল্যাণের দু‘আ করে খুৎবা সমাপ্ত করেন।

---

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৬।

সময় তো ফুরিয়ে এলো, নববর্ষ ও পহেলা বৈশাখে কেন আনন্দ কর?

*-জাবির হোসেন**

হে মুসলিম! শোনো—

সময় অতিবাহিত হচ্ছে দ্রুতগতিতে। পৃথিবী নাকি আধুনিক হচ্ছে। নিত্যনতুন আবিষ্কৃত হচ্ছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। শান্তির ঠিকেদারেরা তৈরি করেছে মানুষ মারার মারণাস্ত্র। মানবতা আজ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। পৃথিবীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেউ কাউকে এক বিঘত জমি ছেড়ে দিতে রাজি নয়। অথচ সৃষ্টিকর্তার হুঁশিয়ারি, 'মানুষের হিসাব কিতাবের সময় নিকটবর্তী, অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে' *(আল-আম্বিয়া, ২১/০১)*।

একজন মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পর, শিশু থেকে ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করে। অতঃপর বার্ধক্য তাকে গ্রাস করে। তারপর এই অল্প সময়ের সুখ-দুঃখের জীবন দুনিয়াতে উপভোগ করে তাকে পাড়ি দিতে হয়— অনন্ত এক গন্তব্যে। —মৃত্যু! মৃত্যু হলো একটি চিরসত্য বিষয়। পবিত্র কুরআনে উচ্চারিত হয়েছে, 'নিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৮৫)*। আমরা ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অথচ আমরা সৃষ্টিকর্তার বিধানের প্রতি তোয়াক্কা করি না। আমাদের প্রতিদিনই কেটে যায় সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায়।

পহেলা বৈশাখ এসেছে। এসেছে বাংলা নতুন বছর। বাংলা নববর্ষ। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে, নতুন বছরকে বরণ করে নিতে তুমি প্রস্তুত। বর্ষবরণের নামে আনন্দোৎযাপনে মেতে ওঠা, 'শুভ নববর্ষ' বলে উইশ করা, ইলিশ-পান্তা খাওয়া, মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, গান-বাজনা, মেলা ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হওয়া তোমার কাছে হয়ে উঠেছে সংস্কৃতির অঙ্গ। অথচ দাবি কর— তুমি মুসলিম।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও না। আর তোমরা সেই আল্লাহকেই সিজদা করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করতে চাও' *(হা-মীম আস-সাজদা, ৪১/৩৭)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'নিশ্চয় মাসসমূহের সংখ্যা আল্লাহর কাছে ১২ মাস, সুনির্দিষ্ট রয়েছে আল্লাহর কিতাবে সেদিন থেকে যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন' *(আত-তওবা, ৮/৩৬)*। সুতরাং, বর্ষপরিক্রমা ও ঋতুবৈচিত্র্য মহান আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে মুঘলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরী সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করতে হতো। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজী সৌর সন এবং আরবী হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় (৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬) থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে 'বঙ্গাব্দ' বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।[১]

হে মুসলিম! বছর তো একটি আপেক্ষিক বিষয়। নতুন বছর এলো, তার অর্থ তোমার জীবন থেকে একটি বছর কমে গেল— এই চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক কবে হবে? —তা না করে তুমি, দিনটিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছো। বাংলা নববর্ষ সাড়ম্বরে পালন করছ। বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণ করছ। রমনা বটমূলে এসে রবি ঠাকুরের 'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো...' গান গেয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছ। তুমি মঙ্গল শোভাযাত্রায় শরীক হচ্ছো। তোমার কাছে ইলিশ-পান্তা হয়ে উঠেছে বৈশাখের এক অনুষঙ্গ। তুমি পহেলা বৈশাখের নামে অমুসলিম সংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করছ। গান-বাজনার প্রতি আসক্ত হচ্ছ। নববর্ষের দিন শুভেচ্ছা বিনিময় করছ। তুমি বর্ষবরণের নামে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা চর্চায় মগ্ন। তুমি করছ আনন্দের নামে অপচয়। — এছাড়াও আরও কত কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি, হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিতে জর্জরিত তার তালিকা দীর্ঘ।

নতুন বছরের বর্ষবরণে তোমার উদ্দেশ্য আনন্দ-উল্লাস, হৈ-হুল্লোড় করে সময় পার করা। কিন্তু তুমি কি ভেবে দেখেছ, তুমি মুসলিম। তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমাকে দুনিয়াতে আনন্দ-

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. উইকিপিডিয়া।

ফুর্তি করে সময় পার করার জন্য পাঠাননি। তুমি বলতে পার না, 'খাও দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়'। তোমার প্রভু তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদত করার জন্য। তিনি জানিয়েছেন, 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্য যে, যেন তারা আমারই ইবাদত করে' *(আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬)*।

হে মুসলিম! তোমার অবগতির জন্য বলি, এ জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। তোমার প্রতিপালক জানিয়েছেন, 'তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?' *(আল-মুলক, ৬৭/২)*। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের ব্যবস্থা এজন্য করেছেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, এই জীবনের সদ্ব্যবহার কে করে? যে এই জীবনকে ঈমান ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং যে এর অন্যথা করবে, তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[২]

বন্ধু! তুমি তো এই জীবনের বহু পরীক্ষাতে বসেছো। — একাডেমিক পরীক্ষা, চাকরির পরীক্ষা, বা আরও অন্য কোনো পরীক্ষা। ধরো— কোনো পরীক্ষার সময় তিন ঘণ্টা। পরীক্ষা হলে তোমার সঙ্গে তোমারই মতো আরও অনেক পরীক্ষার্থী আছে। এখন এই তিন ঘণ্টা সময়কে যদি তুমি ইচ্ছাকৃত অবহেলা করে হৈ-হুল্লোড় করে পার করে পরীক্ষাতে ফেল কর, তাহলে তোমাকে কী বলা হবে? —বোকা নয় কি? — হ্যাঁ। কেননা, পরীক্ষা হলে সময়কে তুমি মূল্যায়ন করনি। পক্ষান্তরে তোমার বন্ধু, সময়কে মূল্যায়ন করে, গুরুত্ব দিয়ে প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখেছে, ফলে সে পরীক্ষাতে পাশ করে গেছে। তোমার বন্ধুকে বলা হয়— বুদ্ধিমান।

বন্ধু! দুনিয়ার পরীক্ষায় ফেল করলে, পরের বার পুনরায় পরীক্ষায় বসার সুযোগ থাকে। কিন্তু জীবনের পরীক্ষার ঘণ্টা যদি বেজে যায়, তোমার দেহ থেকে যদি প্রাণবায়ু বের হয়ে যায়— তাহলে তোমার জীবনের পরীক্ষা সম্পূর্ণ শেষ। দ্বিতীয় বারের কোনো সুযোগ নেই। তবুও তুমি সচেতন হবে না?!

তুমি মুসলিম! তোমার ধর্ম ইসলাম। তোমার নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর প্রতিটি ইবাদত তোমার সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির অনুশীলন করতে তুমি বাধ্য। তোমার সংস্কৃতির ম্যানুয়াল গাইড হলো— পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। পক্ষান্তরে, বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুশীলন তোমার জন্য অবৈধ। তোমার নবীর হুঁশিয়ারি, 'যে ব্যক্তি বিজাতীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে'।[৩]

হে মুসলিম! পহেলা বৈশাখের 'বর্ষবরণ' অনুষ্ঠান উদযাপন তোমার সংস্কৃতি নয়। এটি তোমার ইসলামী শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক একটি সংস্কৃতি। এটি অমুসলিমদের সংস্কৃতি। যা তুমি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছ।

হে মুসলিম! তুমি নববর্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছ। মতবিনিময় করছ। বলছ— 'শুভ নববর্ষ'। অথচ তুমি মুসলিম। কামনা বা শুভেচ্ছা নয়, দু'আ হলো ইসলামী রীতি। শুভেচ্ছা অর্থ আমাদের মনের ভালো ইচ্ছা। আর মানুষের কামনা বা ইচ্ছার মূল্য কী? মূল্য তো মহান আল্লাহর ইচ্ছার। এজন্য তার দরবারে দু'আ করতে হবে নতুন বছরের সফলতার জন্য। এছাড়া অন্তসারশূন্য ইচ্ছা কামনা কোনো পরিবর্তন আনে না; বরং পরিবর্তনের সুদৃঢ় সংকল্প, নতুন বছরকে নতুনভাবে গড়ার সুদৃঢ় ইচ্ছা ও কর্মই পরিবর্তন আনে। কুরআন ও হাদীছের নির্দেশনা থেকে আমরা জানি যে, সৃষ্টির সেবা ও মানুষের উপকারই জাগতিক জীবনে মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের অন্যতম উপায়। অনুরূপভাবে মানুষের ক্ষতি করা বা ব্যক্তি বা সমাজের অধিকার নষ্ট করা আল্লাহর গযব ও শাস্তি লাভের অন্যতম কারণ। এসো আমরা সকলে মহান আল্লাহর নির্দেশ মতো তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের অধিকার আদায় ও ক্ষতি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নতুন বছরের সূচনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন।[৪]

বন্ধু আমার! তুমি পহেলা বৈশাখে 'ইলিশ-পান্তা'য় মেতে উঠেছ। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বলতে হচ্ছে, বৈশাখী সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়েছে এখন বাংলাদেশের জাতীয় মাছ 'ইলিশ'। কথিত সংস্কৃতিসেবীরা এদিন 'ইলিশ-পান্তা' খেয়ে থাকেন। অথচ ইলিশের জাটকা বৃদ্ধির মওসুম হলো নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত। ইলিশ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। বাংলাদেশের জিডিপিতে অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ে এককভাবে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ। এ মাছ মানুষের রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমায়। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এ ধরনের একটি মহামূল্যবান মাছকে নির্মূল করার মিশনে নামেন উভয় বাংলার কথিত

২. তাফসীর আহসানুল বায়ান, সূরা আল-মুলক, ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৪৩৪৭।

৪. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খুতবাতুল ইসলাম (আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স), পৃ. ৩২।

বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারক সুশীল সমাজভুক্ত একদল লোক। এরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে 'ইলিশ-পান্তা' খাওয়ার বিলাসী প্রতিযোগিতায় নামেন এদিন। যা পহেলা বৈশাখ উদযাপনের নামে 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' যাদের, তাদের সাথে নিষ্ঠুর রসিকতার শামিল।[৫]

বন্ধু আমার! তুমি মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করছ। মঙ্গল শোভাযাত্রা কী?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে প্রতিবছরই পহেলা বৈশাখে ঢাকা শহরের শাহবাগ-রমনা এলকায় এই মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের প্রতীকী শিল্পকর্ম বহন করা হয়। এছাড়াও বাংলা সংস্কৃতির পরিচয়বাহী নানা প্রতীকী উপকরণ, বিভিন্ন রঙের মুখোশ ও বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি নিয়ে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়।[৬]

তুমি মুসলিম। তুমি কীভাবে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পার। যেখানে মুখোশ, মূর্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। এখান থেকে তুমি কীভাবেই বা মঙ্গল লাভের আশা করতে পার। অথচ তোমার জানা উচিত, ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে প্রাণ ফুঁকতে পারবে না'।[৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফেরেশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং ঐ ঘরেও না, যে ঘরে ছবি থাকে'।[৮] তোমার আরও জেনে রাখা উচিত, কোনো সময়কে শুভ বা অশুভ মনে করা কোনো মুসলিমের কাজ নয়। মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। মহান আল্লাহ বলেন, 'শোনো! তাদের অশুভ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না' *(আল-আʼরাফ, ৭/১৩১)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো বস্তুকে কুলক্ষণ মনে করা শিরক'।[৯] তিনি আরও বলেছেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোনো বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি জাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) জাদু করা হয়'।[১০]

বন্ধু আমার! এছাড়াও তুমি বৈশাখী উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ কর, যেখানে গান-বাজনা চলে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকে, অশ্লীলতার চর্চা হয়। কিন্তু তোমার জেনে রাখা ভালো, গান-বাজনা ইসলামে হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি' *(লুক্বমান, ৩১/৬)*। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই! নিশ্চয় তা (অসার বাক্য) হচ্ছে গান।' এছাড়াও রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে, যারা যেনা, (পুরুষের জন্য) সিল্ক, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে'।[১১] এছাড়াও, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতার চর্চা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

বন্ধু আমার! তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের এই জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষা। পরীক্ষার ফলাফল তোমাকে সুনিশ্চিত করবে— তোমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন কোথায়? —জান্নাত, না-কি জাহান্নাম? সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকে যতটুকু আয়ু নিয়ে এসেছ, ততটুকুই তোমার সময়। এই সময়টুকুর কোনোভাবে অবমূল্যায়ন করলে চলবে না। তা নাহলে পস্তাতে হবে শেষ বিচারের দিন। হ্যাঁ— আমরা প্রতি মিনিটে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। মৃত্যু আমাদের এই জীবনের পরিসমাপ্তি। তারপর...! তারপর শুরু হবে নতুন জীবন। কবরের জীবন। কিয়ামতের মাঠ। পুলসিরাত। জান্নাত। জাহান্নাম। এ জীবন হলো আমাদের কর্ম জগৎ। এর পরের জীবন কর্মফলের জগৎ। পহেলা বৈশাখ আসার অর্থ, সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে নিয়ে আসা আমার আয়ুর একটি বছর শেষ হয়ে গেল। এক বছর আয়ু কমে গেল আমার জীবন থেকে। আমার জীবন বসন্ত থেকে খসে পড়ল আরও একটি বছর। সেই আমি, কীভাবে বর্ষবরণে মেতে উঠতে পারি? কীভাবে আনন্দ-উল্লাস, হৈ-হুল্লোড়ে সময় কাটাতে পারি?

---

৫. https://at-tahreek.com/article_details/8320.
৬. উইকিপিডিয়া।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪২।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৪৯।
৯. আবূ দাঊদ, হা/৩৯১০, হাদীছ ছহীহ।
১০. সিলসিলা ছহীহা, হা/২১৯৫।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০; মিশকাত, হা/৫৩৭৫।

কীভাবে সৃষ্টিকর্তার বিধানকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারি? আমার তো চিন্তা করা উচিত ছিল, বিগত দিনে কী করলাম! আমার তো হিসেব করা উচিত ছিল, কতটুকু ইবাদতে সময় পার করলাম! আমার তো আত্মসমীক্ষা করা উচিত ছিল। আমার নিজের নফসের কাছে জবাবদিহি করা উচিত ছিল। মৃত্যুর পরে এই জীবনের সমস্ত কর্মের হিসাব দিতে হবে ভেবে আমার আতঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল। আমার উচিত ছিল সেদিনের কথা ভেবে ভীত হওয়া, যেদিন কেরামান-কাতেবীনের তৈরিকৃত আমলনামা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে; সেদিন প্রত্যেককে বলা হবে, 'তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট' *(বানী ইসরাঈল ১৭/১৩-১৪)*।

সেই আমি কিনা...

আমার চিন্তা এক মুহূর্তে থমকে গেল! আমি মুসলিম! আমার নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি আছে। আমার নিজস্ব কৃষ্টি ও কালচার আছে। আমার নিজস্ব আদর্শ আছে। আমার স্বাধীন সত্তা আছে। আমার স্বাধীন চিন্তাশক্তি আছে। আমার আত্মমর্যাদাবোধ আছে। আমি প্রগতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারি না। আমি আমার স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিতে পারি না। আমার সমাজ ও সংস্কৃতি কোনো মানুষের বানানো নয়। স্রষ্টা প্রেরিত। কুরআন ও হাদীছ হলো উৎস। সেই আমি, কীভাবে মানুষের বানানো স্রষ্টার বিধান উপেক্ষিত নিয়মকে সংস্কৃতি বলতে পারি?— না, ওটা সংস্কৃতি নয়। ওটা অপসংস্কৃতি। আমার সংস্কৃতি কুরআন ও হাদীছ দিয়ে মোড়ানো। আমি কীভাবে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে মেতে উঠতে পারি। আমি তো স্রষ্টার দাস। আমার কর্তব্য তো তারই আনুগত্য করা।

ইসলাম আমার দ্বীন। ইসলাম আমার ধর্ম। আমি ইসলামের অনুসারী। আমি মুসলিম। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(আল-বাক্বারা, ২/২০৮)*।

—হ্যাঁ, আমাকে পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। এমন করা যাবে না, যে নির্দেশগুলো আমার স্বার্থ ও মন পছন্দ হবে, সেগুলোর উপর আমল করব এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো ত্যাগ করব।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ইসলাম সমর্থিত নয়। দিবস উদযাপনের বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলামে আছে বাৎসরিক দুটি ঈদ। আছে সাপ্তাহিক ঈদ— জুমআ। আমরা প্রতিদিন ও প্রতিরাতই বরণ করি। তবে তা মানবরচিত নয়। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ মোতাবেক। আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। প্রতি সপ্তাহে, বৃহস্পতিবার ও সোমবার ছিয়াম পালন করি। প্রতি মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করি। রামাযান মাসে পুরো মাস ছিয়াম পালন করি। প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করি। প্রতি সকাল বেলা চাশতের ছালাত আদায় করি। ছাদাক্বা করি। যাকাত আদায় করি। হজ্জ করতে যাই। আমাদের এই ফরয ও নফল ইবাদতগুলো পালনের মধ্য দিয়ে বরণ করি— প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস ও প্রতিটি বছর। আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রায় কল্যাণ খুঁজি না। কল্যাণ খুঁজি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কথায়। তিনি বলেছেন, 'রাতের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোনো মানুষ সে সময় লাভ করতে পারে, তবে আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের কোনো কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তাকে দান করেন। আর এ সময়টি প্রতি রাতেই রয়েছে'।[১২] এছাড়াও জুমআর দিন সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, 'জুমআর দিন হলো সপ্তাহের দিনসমূহের নেতা এবং তা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। এ দিনটি আল্লাহর নিকট কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিত্বরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এ দিনে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য : এ দিন আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করেন, এ দিনই আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান এবং এ দিনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোনো বান্দা তখন আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন, যদি না সে হারাম জিনিসের প্রার্থনা করে এবং এ দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান-জমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুমআর দিন শঙ্কিত হয়'।[১৩] আমরা কল্যাণ খুঁজি— লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রিতে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম *(আল-ক্বদর, ৯৭/৩)*। এগুলোই আমাদের ইবাদত। এই ইবাদতগুলোই আমাদের সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতি। এগুলোই আমাদের আল্লাহর দয়া, রহমত ও বরকত পেতে সাহায্য করবে। এগুলোই আমাদের 'জান্নাত' নামক ফাইনাল ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দেবে।

আর তুমি— স্রষ্টার বিধানকে উপেক্ষা করে, অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কারকে বরণ করে, দুনিয়ায় আনন্দ-ফুর্তির মাধ্যমে সময় পার করলে তোমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন হলো 'জাহান্নাম'। অতএব, সাবধান! সিদ্ধান্ত তোমার!

---

১২. ছহীহ মুসলিম, হ/৭৫৭; মিশকাত, হা/১২২৪।

১৩. ইবনু মাজাহ, হা/১০৮৪, হাদীছ হাসান।

গ্রন্থ পরিচিতি-১৩ : সুনানে ইবনু মাজাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেখে যাওয়া আমানত হাদীছ। সেই হাদীছের সংকলন, রক্ষণাবেক্ষণে মুহাদ্দিছ ইমামগণের ভূমিকা আদৌ ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। তদুপরি আজকে আমরা সেই সকল ক্ষণজন্মা মুহাদ্দিছ ইমামগণের মধ্য হতে ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ রচিত একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বিবরণ : এর নাম 'আস-সুনান' (السُّنَن)। ইমাম ইবনে মাজাহর দিকে সম্বন্ধিত করে একে 'সুনান ইবনে মাজাহ' (سُنَنُ ابْنِ مَاجَةْ) বলা হয়। সুনান বলতে ওই সকল গ্রন্থকে বুঝায়, যেখানে পবিত্রতা অধ্যায় হতে শুরু করে অছীয়ত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় ফিক্বহী ক্রমধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ হয়। ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ গ্রন্থটিকে ২৩০ হিজরীর পর (২৬০ হিজরীর পূর্বে) রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটিকে কুতুবে ছিত্তাহ তথা ৬টি অতীব প্রসিদ্ধ হাদীছগ্রন্থের অন্যতম বিবেচনা করা হয়। গ্রন্থটিতে মোট ৪৩৪১টি হাদীছ রয়েছে।[১]

বৈশিষ্ট্যাবলি : গ্রন্থটি খুবই চমৎকার রচনাশৈলীতে প্রণীত ও সুখপাঠ্য। এর কয়েকটি গুণ নিম্নরূপ—

(১) এ গ্রন্থটির হাদীছের সাথে অধ্যায়-অনুচ্ছেদের শিরোনামের মিল স্পষ্ট। অর্থাৎ শিরোনাম অনুসারে হাদীছের উপস্থাপন হয়েছে।

(২) বাব বা অনুচ্ছেদসমূহের মধ্যে থাকা শিরোনামগুলো মূলত হাদীছের মতনে থাকা ফিক্বহী মাসআলাকে নির্দেশ করার জন্য রচিত হয়েছে। আর এটা এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যে, যে কোনো পাঠক পাঠ করা মাত্রই অনুধাবনে সক্ষম হবে।

(৩) এই গ্রন্থে হাদীছের পুনরাবৃত্তি নেই। যা অন্যান্য সকল হাদীছের গ্রন্থে বিদ্যমান। অর্থাৎ একই হাদীছের বারংবার উল্লেখ হতে এ গ্রন্থটি মুক্ত।

(৪) এটি শুধু হাদীছের গ্রন্থ নয়। বরং কেউ যদি একে ফিক্বহের গ্রন্থ হিসেবে অধ্যয়ন করে, তাহলেও তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

(৫) অসংখ্য হাদীছের 'গরীব' (غَرِيْب) হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

(৬) যে হাদীছটি যে শহরের বা এলাকার মুহাদ্দিছগণ এককভাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনু মাজাহ সেই এলাকার সেই হাদীছটি বর্ণনা করার সময় উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, এ হাদীছটি অমুক এলাকার রাবী বর্ণনা করেছেন।

(৭) এ গ্রন্থে এমন ৪৮২টি ছহীহ হাদীছ রয়েছে, যা বাকী ৫টি গ্রন্থে নেই।

(৮) এ গ্রন্থে এমন ৩০০২টি হাদীছ রয়েছে, যেগুলো বাকী ৫টি গ্রন্থে বর্ণিত হলেও ইবনু মাজাহ সেগুলো ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ উক্ত ৩০০২টি হাদীছের এমন কিছু ভিন্ন সনদ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাকী ৫টি গ্রন্থে নেই- যদিও হাদীছগুলো রয়েছে। কিন্তু ইবনু মাজাহর সনদগুলো সেসব গ্রন্থে নেই।

(৯) ছহীহ, যঈফ মিলিয়ে মোট ১৩৩৯টি হাদীছ রয়েছে, যেগুলো অবশিষ্ট পাঁচটি গ্রন্থে নেই। এই অতিরিক্ত ১৩৩৯টি হাদীছ একত্রে 'যাওয়ায়েদ' নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে।

(১০) শায়েখ আলবানী রাহিমাহুল্লাহ-এর তাহক্বীক্ব মোতাবেক 'ইবনু মাজাহ' গ্রন্থে ৯৪৮টি যঈফ হাদীছ রয়েছে।

ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ : অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থগুলোর মতো সুনানে ইবনু মাজাহরও অনেকগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে। যেমন—

১. হাফেয মুগলতাঈ হানাফী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'শারহে সুনানে ইবনু মাজাহ'। এটি পাঁচ খণ্ডে রচিত।

২. ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'মিছবাহুয যুজাজা'। এটি এক খণ্ডে প্রণীত।

৩. ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'মা তামাসসু ইলাইহিল হাজাহ'।

৪. ইমাম কামালুদ্দীন দুমায়রী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'আদ-দীবাজাহ আলা সুনান ইবনে মাজাহ'।

৫. ইমাম বুরহানুদ্দীন হালাবী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'শারহে সুনান ইবনে মাজাহ'।

৬. আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'কিফায়াতুল হাজাহ ফী শারহে সুনান ইবনে মাজাহ'।

৭. ওয়াহীদুয যামান রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত 'রফউল আজাজা আন সুনান ইবনে মাজাহ'।

৮. আল্লামা আব্দুল গনী মুজাদ্দেদী দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'ইনজাহুল হাজাহ'।

৯. পাকিস্তানের আধুনিক যুগের আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ আলী জানবায প্রণীত 'ইনজাযুল হাজাহ বি শারহি সুনানে ইবনে মাজাহ'। গ্রন্থটি ছয়টি বৃহৎ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এর কাজ অদ্যাবধি চলমান। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত সবগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থই আরবী ভাষায় রচিত। এছাড়া উর্দূ ভাষাতেও অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণীত হয়েছে।

১. ফুয়াদ আব্দুল বাক্বীর তাহক্বীক্ব অনুসারে।

ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :

নাম : উপরিউক্ত গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ। তার পুরো নাম হল 'আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রিবঈ আল-কাযবীনী। তিনি ইবনু মাজাহ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের কাযবীনে জন্মগ্রহণ করেন।

উস্তাযগণ : তিনি অসংখ্য বর্ষীয়ান উস্তাযের কাছে অধ্যয়ন করেছেন। যেমন আবূ বকর ইবনু আবী শায়বাহ, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের, হিশাম ইবনু আম্মার দামেশকী, মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার প্রমুখ রাহিমাহুমুল্লাহ।[২]

ছাত্রগণ : ইবরাহীম ইবনু দীনার, আবূ ইয়া'লা আল-খলীলী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আস-সাফফার রাহিমাহুমুল্লাহ সহ অগণিত ছাত্র রয়েছে।[৩]

উলামায়ে কেরাম মন্তব্য : এখানে কয়েকজন মনীষীর প্রশংসাবাণী তুলে ধরা হলো—

১. হাফেয মিযযী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, الحافظ، صاحب كتاب السنن ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة 'তিনি হাদীছের হাফেয, সুনানে ইবনু মাজাহ গ্রন্থের প্রণেতা, অসংখ্য উপকারী গ্রন্থের রচয়িতা এবং (ইলমের সন্ধানে) ব্যাপক ভ্রমণকারী ছিলেন'।[৪]

২. হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ابن ماجه الحافظ الكبير المفسر صاحب السنن والتفسير والتاريخ ومحدث تلك الديار 'ইমাম ইবনু মাজাহ হাদীছের উচ্চমাপের হাফেয, মুফাসসির, সুনানে ইবনু মাজাহ, তাফসীর ও ইতিহাসের লেখক। তিনি তৎকালীন সময়ের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ছিলেন'।[৫]

৩. ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, صاحب السنن أحد الأئمة حافظ صنف السنن والتفسير والتاريخ 'তিনি সুনান গ্রন্থের লেখক, অন্যতম একজন ইমাম, হাদীছের হাফেয। তিনি সুনান, তাফসীর ও তারীখের গ্রন্থ রচনা করেছেন'।[৬]

মৃত্যু : ইমাম ইবনু মাজাহ ৬৪ বছর বয়সে ২৭৩ হিজরীতে এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের কাছে চলে যান।[৭] আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন- আমীন!

উপসংহার : অন্য হাদীছের গ্রন্থাবলির পাশাপাশি সুনানে ইবনু মাজাহ গ্রন্থেরও অধিক মাত্রায় অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা ইলমে হাদীছের জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতে হলে এই গ্রন্থের পরশ পেতেই হবে।

২. সুনানে ইবনু মাজাহ হা/১-৬ দ্র.।
৩. মিযযী, তাহযীবুল কামাল, রাবী নং ৫৭১০।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, রাবী নং ১০।
৬. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬৪০৯।
৭. প্রাগুক্ত।

হক্বের মানদণ্ড-এর বাকী অংশ

কেউ তাবেঈ নয়, সেহেতু সবাই উক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মর্যাদায় সমান। ইমাম বায়যাবী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, والذين اتبعوهم ـ بإحسان اللاحقون بالسابقين من القبيلتين أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة 'আর যারা সুন্দরভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছে'। অনুসরণীয় অগ্রগামীগণ হচ্ছেন দুই গোত্রের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী ছাহাবীগণ এবং তারাও যারা তাদের পরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঈমান এবং আনুগত্যের সহিত তাদের অনুসরণ করবেন' *(তাফসীরে বায়যাবী, ২/৩৪৬, সূরা আত-তওবা, ৯/১০০)*।

এরপরও যদি আপনারা বলেন যে, কিছু হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা অন্যদের থেকে বেশি যেমনটি লেখক বলেছেন যে, 'তাবঈযুস ছহীফা' বইয়ে ইমাম সুয়ূতী রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদা বর্ণনায় ছহীহ বুখারীর এই হাদীছটিই যথেষ্ট। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান আল-ফারেসী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর হাত রেখে বললেন, لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ 'ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছে থাকলেও আমাদের কিছু লোক অথবা তাদের (পারস্যদের) এক ব্যক্তি তা অবশ্যই পেয়ে যাবে' *(তাবয়ীযুস ছহীফা, পৃ. ৮)*। তথাপিও অন্যান্য ইমামদের উপর তার মর্যাদা প্রমাণিত হবে না। কেননা অন্যান্য ইমামগণও এরূপ অনেক হাদীছের উদ্দেশ্য হতে পারেন। যেমন, يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ 'অচিরেই লোকেরা ইলম তালাশে তাদের উটের উপর চড়ে সফর করবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেম অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী আর কাউকে পাবে না' *(তিরমিযী, হা/২৬৮০; মিশকাত, হা/২৪৬)*। এই হাদীছের উদ্দেশ্য ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ হতে পারেন। আর ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ কয়েকটি হাদীছের উদ্দেশ্য হতে পারেন। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ এ মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর আপনারা যদি বলেন যে, এই হাদীছগুলোতে তো কোনো ইমামের নাম বলা নেই যে, এ হাদীছ দ্বারা অমুক ইমাম উদ্দেশ্য; বরং মানুষেরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী একেক ইমামকে উদ্দেশ্য বানিয়েছে, তাহলে তো কোনো কথা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে— ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর নাম উল্লেখ্য করে এমন কিছু হাদীছ বর্ণনা করা হয়, যেগুলোতে ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মর্যাদাকেই স্পষ্ট করে। *(চলবে)*

আল-কুরআন

-আবু বকর ছিদ্দীক্ব
ছাত্র, সপ্তম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

অবিরাম শান্তি দেয় অন্তরে
মনকে দেয় ভালো করে
দুঃখ-কষ্ট দেয় দূর করে
প্রশান্তি আনে মনের ঘরে।
সুন্দর করে সাজানো গোছানো
বাক্যের সাথে বাক্য মিলানো
ভুল পাবে না কোনো দিনও।
সরল পথের দিশা দিবে
সত্য-মিথ্যার মোচন করবে
অন্ধকার থেকে দ্বীনের তরে
কুরআন তোমায় আলো দেখাবে।

শপথ

-শাহিন ইসলাম, বগুড়া।

পুতুলপূজা করব না আর
বলব না দাও কিনে মা,
শুনব না গান বাদ্য-বীণা
দেখব না আর সিনেমা।
পণ করেছি চলব মেনে
প্রভুর দেওয়া অহি মা,
দূর হবে সব নাফরমানী
ভুলব না তাঁর মহিমা।
কেউ যেন পাপ না করে ফের
এই নীতি হোক বিলি মা,
হিংসা-বিভেদ ভুলব এবার
আঁকব সুখের নীলিমা।
করব না জিদ দাও না এবার
দুধমাখা ভাত গালে মা,
সত্যই আমি পড়ব সদা
কুরআন-হাদীছ কালেমা।

কবর

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ
মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

বয়স কখন টানবে ইতি কেউ কি জানি ভাই?
আর কিছু নয়, পথ ও পাথেয় চলো করে যাই।
কবর সবার সকাল বিকাল ডেকে ডেকে যায়
বেখবরে মানুষগুলো শুনতে নাহি পায়।
একা একা থাকতে হবে ভিন্ন সে এক ঘর
বাড়ি গাড়ি কেড়ে নিয়ে সবাই হবে পর।
তবু নাহি মন্দ খাতা বন্ধ করি ঢের
একটু কি আর ভেবে দেখি কবর নিয়ে ফের?
মিছে মায়া ভালোবাসা এ জগতের সব
চক্ষুখানা বন্ধ হলে থামবে কলরব।
নেকী করে পরপারে যেতে পারলে ভাই
কবর হাশর ছিরাত পুলে ভয়ের কারণ নাই।
এসো সবাই কবর দেশের একটু রাখি ভয়
তবেই মুক্তি হাসিখুশি আখেরাতে জয়।

ধন্য করো জীবন

-মো. শাহানুর ইসলাম
পাকেরহাট, খানসামা, দিনাজপুর।

বুকে যদি ভেঙে পড়ে
বাঁধ ভাঙা এক নদী,
মুনাজাতে দু'হাত তুলে
কাঁদো নিরবধি।
প্রভুর কাছে বলতে পার
মনের গোপন কথা,
সব ভয় তো কাটিয়ে যাবে
জমিয়ে রাখা ব্যথা।
অনিত্য এই ধরণিতে
নয় তো কেহ আপন,
প্রভুর প্রেমের সুধা নিয়ে
ধন্য করো জীবন।

বাংলাদেশ সংবাদ

রেল-নৌ-সড়ক দুর্ঘটনায় এক বছরে ৫৬৮৯ মৃত্যু

২০২১ সালে সারা দেশে সড়ক, নৌ ও রেলপথে ৪ হাজার ৯৮৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ হাজার ৬৮৯ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন ৫ হাজার ৮০৫ জন। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর পরিসংখ্যানে এসব তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, ২০২১ সালে বিগত দুই বছরের তুলনায় সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে। ২০২১ সালটিও ছিল করোনা মহামারির বছর। প্রায় ৬ মাস জরুরী যানবাহন ছাড়া অন্যান্য যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। যে কারণে সড়ক দুর্ঘটনা আরও কম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হচ্ছে গেল বছর সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানে। সড়কে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর হিসাব তুলে ধরে বলা হয়, ২০২১ সালে সারা দেশে সড়ক, নৌ ও রেলপথে ৪ হাজার ৯৮৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫ হাজার ৬৮৯ জন। এছাড়া আহত হয়েছেন ৫ হাজার ৮০৫ জন। নিহতদের মধ্যে পুরুষ ৪ হাজার ৫০৭ জন এবং ১ হাজার ১৮২ জন নারী। আহতদের মধ্যে পুরুষ ৪ হাজার ৫৩১ ও নারী ১ হাজার ২৭৪ জন। এর মধ্যে সড়কপথে, ৩ হাজার ৭৯৩টি দুর্ঘটনায় নিহত হন ৪ হাজার ২৮৯ জন। আহত হন ৫ হাজার ৪২৪ জন। রেলপথে ২৭০টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ২৫৪ জন, আহত হয়েছেন ৪২ জন। নৌপথে ৯০টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১৯৮ জন, নিখোঁজ হয়েছেন ১৮৬ জন ও আহত হয়েছেন ৩৩৯ জন। এছাড়াও অপ্রকাশিত তথ্য ও হাসপাতালে ভর্তির পর এবং হাসপাতাল থেকে রিলিজের পর ৯৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ও কারণ হিসেবে নিশচা জানায়, সড়কে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের অভাব, টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত ১১১টি সুপারিশনামা বাস্তবায়ন না হওয়া, চালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর প্রবণতা, দৈনিক চুক্তিভিত্তিক গাড়ি চালানো, লাইসেন্স ছাড়া চালক নিয়োগ, পথচারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ওভারটেকিং করা, বিরতি ছাড়াই দীর্ঘসময় ধরে গাড়ি চালানো, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধে আইনের প্রয়োগ না থাকা, সড়ক-মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও তিন চাকার গাড়ি বৃদ্ধি এবং মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি।

এক বছরে ৮১৮ শিশু ধর্ষণ, ১৮৩ হত্যা

করোনাকালীন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ৮১৮টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৯৪টি শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১৪ জন কন্যাশিশুকে। এ সময়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১১০টি শিশু। এর আগের বছর ২০২০ সালে শিশুধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৬২৬টি। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর পর্যালোচনায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। দেশের ৫টি বাংলা দৈনিক ও ৩টি জাতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত শিশু অধিকার বিষয়ক সংবাদ পর্যালোচনা করে এই তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গতবছর আত্মহত্যা করেছে ৭৮টি শিশু। এর মধ্যে ৫৭ জন ছেলে এবং ২১ জন মেয়ে শিশু। এই সময়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে আহত হয়েছে ২৩ জন শিশু। ২০২০ সালে আত্মহত্যাকারী শিশুর সংখ্যা ছিল ৩৪। মূলত পরীক্ষায় ফল-বিপর্যয়, পরিবারের ওপর রাগ, উত্ত্যক্ত হয়ে, ধর্ষণ বা ধর্ষণ চেষ্টা, ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানির বিচার না পাওয়া এবং সাইবার ক্রাইম ব্ল্যাকমেইলের শিকার হয়েও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতবছর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ১৮৩টি শিশু এবং হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ১৩৫টি শিশুকে। ২০২০ সালে হত্যার শিকার হয়েছিল ১৪৫ জন শিশু। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর সর্বনিম্ন বয়স ছিল ২ বছর। এর বাইরে নানা ধরনের নির্যাতনে আহত হয়েছে ২৫৪টি শিশু। নিখোঁজ হয় ৩৮ জন। পানিতে ডুবে মারা গেছে ৫৭০টি শিশু। ২০২০ সালে পানিতে ডুবে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৬৫। ২০২০ সালে নিখোঁজ ও অপহরণের শিকার হয়েছে ২২। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় ২০২১ সালে নিহত হয়েছে ৬৯ শিশু। তার আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ১৫৮। শিশু নির্যাতনের ৫৬টি ঘটনার মাধ্যমে ২৫৪টি শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। ২০২০ সালে শিশু নির্যাতনের ১৬টি ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ২০২১ সালে অপরাধে সংশ্লিষ্ট হওয়া শিশুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২০ যা ২০২০ সালে ছিল ২টি। শিশুদের নিয়ে ২৫টি বিষয়ের ওপর নেতিবাচক খবর ছাপা হয়েছে ১ হাজার ৯৩০টি। ইতিবাচক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১২টি বিষয়ের উপর ১০৬টি। ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েশিশুর সংখ্যা ৩৮ এবং সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ঢাকায়। ৩৮ জন গৃহকর্মী ধর্ষণসহ নানা ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১২ জন নিহত, ২৪ জন আহত ও ২ জন আত্মহত্যা করেছে। নিহত গৃহকর্মীদের মধ্যে ৪ জন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

আফ্রিকার কোটি মানুষ মারাত্মক দুর্ভিক্ষে

তীব্র খরার কবলে আফ্রিকা। বৃষ্টি না হওয়ায় ফলানো যাচ্ছে না কোনো ফসল। এতে কেনিয়া, সোমালিয়া ও

ইথিওপিয়াসহ ওই অঞ্চলের দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে তীব্র খাদ্য সংকট। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) বলছে, অঞ্চলটিতে এরই মধ্যে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়েছে এক কোটি ৩০ লাখের বেশি মানুষ। জরুরী ভিত্তিতে তাদের সহায়তা করা না গেলে অঞ্চলটিতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। একদিকে যখন সাইক্লোন, তুষারঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল, তখন তীব্র খরার কবলে আফ্রিকা মহাদেশ। খাদ্যের অভাবে শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখিও আছে চরম কষ্টে। পানির অভাবে মাইলের পর মাইল ধু ধু মরুভূমি। ২ বছর ধরে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। শুধু ধূলিঝড় হচ্ছে। আফ্রিকার সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও কেনিয়ার পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। ১৯৮১ সালের পর এই প্রথম এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়ছে দেশগুলো। খাদ্য ও পানির অভাবে কঙ্কালসার অবস্থা শিশুসহ বেশিরভাগ মানুষের। খরার কারণে বেশি কষ্টে আছে ইথিওপিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব, কেনিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ মধ্য সোমালিয়ার জনগোষ্ঠী। এসব অঞ্চলে অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে বেশিরভাগ মানুষ।

মুসলিম বিশ্ব

একাকী ভ্রমণে নারীর সবচেয়ে নিরাপদ নগরী মদীনা

নারীর একাকী ভ্রমণের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ নগরীর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে সঊদী আরবের পবিত্র মদীনা। ভ্রমণবিষয়ক ব্রিটিশ কোম্পানি ইনশিউর মাই ট্রিপ (IMT) এক সমীক্ষায় নারীর একাকী ভ্রমণে সারা বিশ্বের নিরাপদ শহরের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। ওই তালিকায় সবার শীর্ষে মদীনার নাম উঠে এসেছে। আরও বলা হয়েছে, নারীর একাকী ভ্রমণের জন্য নিরাপদ শহরের তালিকার শীর্ষ পাঁচটিই এশিয়ায় অবস্থিত। বাকি শহরগুলো হলো— থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, জাপানের কিয়োটো ও চীনের ম্যাকাও নগরী। সমীক্ষায় ১০/১০ স্কোর পেয়েছে মদীনা। তারপর চিয়াং মাই পেয়েছে ৯.০৬/১০, দুবাই ৯.০৪/১০, কিয়োটা ৯.০২/১০ ও ম্যাকাও পেয়েছে ৮.৭৫/১০ স্কোর। বিশ্বের শীর্ষ নিরাপদ শহরের তালিকা তৈরিতে শহরের সাম্প্রতিক সময়ের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ‘রাতে একাকী হাঁটার সময় নিরাপদ বোধ করা’ ও ‘হামলার অনুপস্থিতি’সহ এ ধরনের বিভিন্ন সমীক্ষার ভিত্তিতে নিরাপদ শহরের তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। অন্য দিকে নারীর একাকী ভ্রমণের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে অনিরাপদ নগরীরও তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ওই তালিকার শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ। এরপরই যথাক্রমে আছে— মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, ভারতের দিল্লী, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা ও ফ্রান্সের প্যারিস।

কুরআনের হাফেয তৈরিতে ব্যাপক সাফল্য তুরস্কে

তুরস্কে ২০২১ সালে প্রায় ১২ হাজার শিশু-কিশোর কুরআনের হাফেয হয়েছে। দেশটির সাধারণ মাদরাসা ও অন্তত ৯০ হাজার মসজিদের ইমাম ও খত্বীবদের দ্বারা পরিচালিত মাদরাসায় পড়ে তারা হিফয সম্পন্ন করেছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড (TRT) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত বছরে পুরো তুরস্কে অন্তত ১১ হাজার ৭৭৩ জন শিক্ষার্থী হিফয সম্পন্নের সনদ গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে অনেকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি হিফয বিভাগে পড়ে এই কীর্তি অর্জন করে। গত গ্রীষ্মে তুর্কি দিয়ানাত কর্তৃপক্ষ দেশটির ৮১টি এলাকা নিয়ে অন্তত ১ হাজার ৬৭৯টি কুরআন শিক্ষা কোর্স চালুর ঘোষণা দেয়। ৬ হাজার ৮৩৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে কোর্সগুলোতে ৭১ হাজার ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় এবং গত বছরের শুরুর কয়েক মাসেই এদের মধ্য থেকে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী হাফেয হওয়ার গৌরব অর্জন করে। তুরস্কে সারা বছরই মাদরাসাগুলোতে কুরআন হিফযের ডে-কোর্স পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের মেধাস্তরের ভিন্নতার ফলে হিফয সম্পন্ন করতেও একেকজনের একেক রকম সময় ব্যয় হয়। কোর্স শুরুর সময় থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ৭৭ হাজার ১৯০ জন শিক্ষার্থী কুরআন মুখস্থের পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোর্সটি স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগে; এক বছর নাযেরা বা কুরআন দেখে দেখে পড়া, দুই বছর হিফয বা মুখস্থ করা।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ‘স্মার্ট সু’

দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে স্মার্ট সু (জুতা) তৈরি করলেন অস্ট্রিয়ার একদল উদ্যোক্তা। বিশেষ এই জুতায় এমন সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সামনে কোনো বাধা দেখলেই এটি সংকেত দেবে ব্যবহারকারীকে। ফলে কারো সহায়তা ছাড়াই নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টেক-ইনোভেশন উদ্ভাবন করেছে ‘ইনোমেক’ নামের এই স্মার্ট সু। আল্ট্রাসাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে বিপদের সংকেত পৌঁছায় ইনোমেক স্মার্ট সু। অন্তত তিন মিটার দূরত্বে কোনো বাধা থাকলে সংকেত দিতে সক্ষম এই জুতা। বার্তা দেয় ভাইব্রেট করে কিংবা স্মার্টফোনের মাধ্যমে। জুতাটিতে অভিনব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। জুতার সামনের দিকে আছে আল্ট্রাসাউন্ড সেন্সর। যা সামনের বাধা অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে তা বুঝতে পারে। অর্থাৎ হাতের ছড়িটি যে বিপদ কাটাতে পারে না, তা পারে ইনোমেক।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আযানের সময় না-কি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেকোনো সময় পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে আযান হয়। অর্থাৎ এমন কোনো সময় বাকি থাকে না যে, সে সময়ে পৃথিবীর কোথাও আযান হচ্ছে না। প্রশ্ন হলো- তাহলে কি আসমানের দরজা সবসময় খোলা থাকে?

-শামিম আক্তার
বারজুমলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : প্রত্যেক আযানের সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় একথা ঠিক। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ 'অর্থাৎ যখন ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দু'আ কবুল করা হয় (সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪১৩; জামে'উল আহাদীছ, হা/১১৯৭)। তবে দরজা কিভাবে খোলা হয় আর কিভাবে বন্ধ করা হয় এটা গায়েবের বিষয়। গায়েব সম্পর্কে মহান আল্লাহ ভালো জানেন। গায়েবের জগতকে আমাদের দুনিয়ার সাথে তুলনা করে প্রশ্ন উত্থাপন করা ঈমান বিরোধী। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। আর এটাই ঈমানের দাবী।

শিরক

প্রশ্ন (২) : শিরকের গুনাহর ক্ষমা পাওয়ার কোনো উপায় আছে কী?

-সিজান বিন জহরুল
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হবে না এমন কোনো পাপ নেই। বরং খালেছ অন্তরে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, বল! হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (আয-যুমার, ৩৯/৫৩)। আর মৃত্যুর পর আল্লাহ চাইলে বান্দার সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন তবে, শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেন না ইহা ছাড়া অন্য সব পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে কেহ আল্লাহর অংশী স্থির করে সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল' (আন-নিসা, ৪/৪৮)। শিরক থেকে বাঁচার জন্য শিরক সম্পর্কে জেনে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আর আল্লাহর নিকট দু'আ করতে হবে। শিরক থেকে বাঁচার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া যায়-

أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু-বিকা আন উশরিকা বিকা, ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লেমা লা-আ'লামু' অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি জেনে বুঝে তোমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে তোমরা নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি ঐ পাপ থেকে যা না জেনে করি বা করবো' (ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬, সনদ ছহীহ)।

বিদ'আত

প্রশ্ন (৩) : হাদীছ দ্বারা জানতে পারি যে, দুই শ্রেণির মানুষ হাউজে কাওছারের নে'আমত থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো, বিদ'আতী। প্রশ্ন হচ্ছে, যে সকল আলেম ইমামগণ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর, বিবাহের পর সম্মিলিত মুনাজাত করে, তারা কি সেদিন হাওযে কাওছারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে?

-শাহজালাল
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : প্রথমেই জানতে হবে যে, নেকির আশায় যা শরীআতে করা হয় অথচ এর প্রমাণে কোনো দলীল পাওয়া যায় না তাই হলো বিদআত। আর ফরজ ছালাতের পর কিংবা বিবাহের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা মর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায় না তাই তা বিদআত বলেই বিবেচিত হবে। আর বিদআতীরা হাওযে কাউছারের পানি থেকে বঞ্চিত হবে এ মর্মে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি হাউযে কাউছারের ক্ষেত্রে তোমাদের আগে আগে থাকবো। তোমাদের কাউকে আমার কাছে নিয়ে আসার সময় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে যেমনটি হারানো উটকে তাড়িয়ে দেওয়া

হয়। তখন আমি বলবো, কেন এমনটি তার সাথে করা হচ্ছে? উত্তরে বলা হবে, আপনি জানেন না যে তারা আপনার পরে কতই না নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। তখন আমি বলবো, দূর হও (ছহীহ মুসলিম, হা/৬১১৪; শারহু মুসলিম লিন নাবাবী, ৩/১৩৭; আত-তাজকিরা, ১/৩৪৮)।

প্রশ্ন (৪) : মৃত ব্যক্তির কবর খননকারীদের জন্য চল্লিশা ব্যতীত ভিন্ন কোনো দিনে খানাপিনার আয়োজন করা যাবে কি?

-আব্দুল বারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ ধরনের খানাপিনার আয়োজন করার পক্ষে শারঈ কোন দিকনির্দেশনা নেই। বরং তা অজ্ঞতার যুগের প্রথা। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হওয়া এবং দাফনের পরে এ উপলক্ষ্যে খানাপিনার আয়োজন করাকে জাহেলী যুগের ক্রন্দন বা বিলাপ হিসাবে গণ্য করতাম (মুসনাদে আহমাদ, হা/৬৮৬৬; ইবনু মাজাহ, হা/১৬১২)। সুতরাং সামাজিকতা রক্ষার নামে এ ধরনের খানাপিনার আয়োজন করা বিদ'আত ও অপচয়, যা পরিত্যাজ্য। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করবে যা শরী'আতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)।

ছালাত

প্রশ্ন (৫) : বর্তমানে ফরয ছালাতে সালাম ফেরানোর পর 'আল্লাহু আকবার' না-কি তিনবার ইস্তিগফার করতে হবে তা নিয়ে খুব আলোচনা চলছে। এই মর্মে সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-ছিয়াম
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ৪২ ওয়ার্ড, বেরাইদ।

উত্তর : প্রথমে উচ্চস্বরে তাকবীর পরে আস্তাগফিরুল্লাহ মর্মে বর্ণিত হাদীছ স্পষ্ট। ভারত উপমহাদেশের প্রায় সকল আহলে হাদীছ আলেম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৩১৪)। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম তাকবীর শ্রবণের মাধ্যমে (ছহীহ বুখারী, হা/৮৪২)। এই হাদীছের উপর ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইবনু খুজায়মা রাহিমাহুল্লাহ ছালাতের পর তাকবীর নামে অধ্যায় রচনা করেছেন (আবু দাউদ, হা/১০০২; ছহীহ ইবনু খুজায়মা, হা/১৭০৬)। আর ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ 'ছালাতের পর যিকির' নামে অধ্যায় রচনা করেছেন। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ উক্ত অধ্যায় দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন অন্য হাদীছে যেখানে ছালাতের পর যিকিরের কথা এসেছে সেই যিকিরের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তাকবীর। যেমন ঈদায়নের ক্ষেত্রে যিকিরের কথা বলা হয়েছে আর ঈদায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যিকির হচ্ছে তাকবীর। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ ছালাফদের থেকে ছালাতের পর তাকবীর বলার কিছু আমলও পেশ করেছেন (ইবনু রজব, ফাতহুল বারী, ৭/৩৯৬)। সুতরাং দলীলের আলোকে ছালাতের পর তাকবীর বলাই উত্তম। তবে এ ব্যাপারে পরস্পরে বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকাই শ্রেয় হবে। আর আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রশ্ন (৬) : ইমাম মুক্তাদীগণসহ বিশ রাকা'আত ছালাত আদায় করেন। ছহীহ সুন্নাহর উপর আমল করার উদ্দেশ্যে ৮ রাকা'আত তারাবীহ পড়ে আমি বের হয়ে আসলে পাপ হবে কি?

-আব্দুল কায়্যুম
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর : আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা আট রাকাআতের কথাই বলেছেন। আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলেন, রমাযান মাসে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছালাত কেমন ছিল? আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগার রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর আরো চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক'আত আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর ছালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন? নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার চোখ ঘুমায়, আমার অন্তর ঘুমায় না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৬৯)। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু আট রাকাতেরই আদেশ

করেছিলেন, বিশ রাকাতের নয় (মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৭৭৩০)। পক্ষান্তরে বিশ রাকাআতের প্রমাণে যত হাদীছ আছে সবই জাল ও যঈফ। এমতাবস্থায় আট রাকাআত আদায় করেই চলে আসতে হবে। কেননা এটিই হলো ছহীহ হাদীছের দাবী।

প্রশ্ন (৭) : তারাবীহর ছালাত মসজিদে না পড়ে বাড়ির ছাদ, গ্যারেজ বা অন্য স্থানে হাফেয নিয়োগ করে পড়া ছহীহ হবে কি?

-শওকত হোসেন
মানিকদি নামাপাড়া, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

উত্তর : তারাবীহর ছালাত নফল ছালাত। আর নফল ছালাত বাড়িতে পড়াই উত্তম। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের বাড়িকে তোমরা কবর বানিয়ে না ফেলে কিছু ছালাত (নফল ছালাত) তোমরা বাড়িতে আদায় করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৭৭)। তাই তারাবীহর ছালাত বাড়িতে, গ্যারেজে কিংবা অন্য স্থানে পড়া যায়। বরং এতে উক্ত স্থানগুলো কবরের মতো হওয়া থেকে মুক্ত হবে। তবে উক্ত স্থানগুলোতে তারাবীহর সাথে এশা ছালাত পড়া যাবে না। কারণ ফরয ছালাতের জন্য ওযর না থাকলে মসজিদে যাওয়া জরুরী।

প্রশ্ন (৮) : তারাবীহ সমাপ্ত হওয়ার পর ইমামের সাথে বিতর পড়া কি আবশ্যক? না-কি নিজে নিজে বাড়িতে পড়ে নিলেও হবে?

-মো. ওয়ালীদ
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর : তারাবীর ছালাত জামাআতে পড়া যেমন জরুরী নয়, তেমনই বিতর ছালাতও জামাআতে পড়া জরুরী নয়। কোন মুসল্লীর আরো ছালাত আদায়ের জন্য অথবা একাই বিতর ছালাত আদায়ের জন্য তারাবীর ছালাতের পরে বাড়ি চলে যাওয়া, এমন আমলের কোন প্রমাণ নেই। বরং বিতরসহ তারাবী একা পড়াই উত্তম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ ঘরেও ছালাত আদায় করো। কারণ, মানুষের সবচেয়ে উত্তম ছালাত হল যা সে তার ঘরে আদায় করে, তবে ফরয ছালাত ছাড়া (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৯০)।

প্রশ্ন (৯) : ছালাতের সিজদা ও শেষ বৈঠকে ইসমে আজম পড়া যাবে কি-না?

-জসিমুদ্দীন রায়হান
বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সেজদা ও শেষ বৈঠকে উভয় জায়গাতেই পড়া যাবে। কেননা শেষ বৈঠকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যেকোনো দু'আ পাঠ করা যায়। শেষ বৈঠকে দু'আ পাঠ করার ব্যাপারে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ 'অর্থাৎ (তাশাহহুদের পর) হামদ সানাসহ যা ইচ্ছা পড়তে পারবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৯২৪; মিশকাত, হা/৯০৯)। ইসমে আযম পাঠ করলে দু'আ কবুল হয়। সুতরাং শেষ বৈঠকে যেহেতু দু'আর স্থান তাই তাশাহহুদের পর দরূদ তারপর ইসমে আযম পড়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করা যায়।

প্রশ্ন (১০) : আমাদের বরগুনা জেলায় মহিলা মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইসলাম কী বলে? আমার ঘরের মা-বোনরা সেখানে যেতে পারবে কি?

-রেজাউল করিম
বরগুনা।

উত্তর : মহিলারা তাদের বাড়িতে একাকি অথবা জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করতে পারে এবং তারা তাদের ইমামতিও করতে পারে। যার মধ্যে মহিলা মাদরাসাগুলোও অন্তর্ভূক্ত হবে। এ মর্মে উম্মুল হাসান রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলের স্ত্রী উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা-কে মহিলাদের ইমামতি করতে দেখেছেন। আর তিনি তাদের সাথে তাদের কাতারের (মাঝে) দাঁড়াতেন (মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, ৪৯৮৯; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন)। অনুরূপভাবে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা ও ফরজ ছালাতের ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়ে ইমামতি করতেন। আর ইমামতি করার সময় তাদের মাঝে দাঁড়াতেন (বায়হাক্বী, হা/৫১৩৮)। ইমাম নববী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (আল-খুলাছাহ, ২/৩৯)। ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মহিলারা তাদের বাড়িতে জামা'আতের সহিত ছালাত আদায় করতে পারে (মাজমূআয়ে ফাতাওয়া, ১২/৭৮)। অনুরুপভাবে লাজনা আদ-দায়েমাতেও একই কথা বলা হয়েছে, (আল-লাজনা আদ-দায়েমা, ৮/২১৩)। তবে পৃথকভাবে মহিলাদের মসজিদ তৈরি করে জামা'আতের সহিত ছালাত আদায় করা

মর্মে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। বরং পুরুষদের মসজিদেই আলাদা ব্যবস্থার মাধ্যমে মেয়েরা ছালাত আদায় করবে। বিধায় এমন অবস্থা হতে সকলকে বিরত থাকতে হবে। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা ও ফিতনার মাঝে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহই অধিক জানেন।

প্রশ্ন (১১) : ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে কি ফজরের সুন্নাত আদায় করা যায়?

-শামিম
মিরপুর-১২, ঢাকা।

উত্তর : না, ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে ফজরের সুন্নাত আদায় করা যায় না। কেননা, ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত। ওয়াক্ত হলে কেবল তা আদায় করা যাবে, চাই আযান হোক অথবা না হোক। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭২৫; নাসাঈ, হা/১৭৫৯; মিশকাত, হা/১১৬৪)।

যাকাত

প্রশ্ন (১২) : কোনো ব্যক্তি যদি ছালাত ও ছিয়াম আদায় না করে, তাহলে তার ফিতরা নেওয়া যাবে কি?

-তারিকুজ্জামান
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, ফিতরা নেওয়া যাবে। এটি একটি ইসলামের বিধান। আল্লাহ তাআলা বলেন, সুতরাং তোমাদের যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে ছিয়াম পালন করে' (আল বাকারা, ২/১৮৫)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফারয করেছেন এবং লোকজনের ঈদের ছালাতের বের হবার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৩, মিশকাত, হা/১৮১৫)। অত্র হাদীছে ছোট বড়সহ সকল মুসলিমকেই যাকাতুল ফিতর দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদাক্বাতুল ফিতর ফারয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমাযানের) ছিয়ামকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য (আবূ দাউদ, হা/১৬০৯, মিশকাত, হা/১৮১৮)।

প্রশ্ন (১৩) : যাকাতের টাকা দিয়ে বোনের শ্বশুর বাড়িতে ইফতার অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-খালেদ মাহমুদ
চট্টগ্রাম।

উত্তর : যাকাতের সম্পদকে আল্লাহ তা'আলা ফকীর মিসকীনসহ আট শ্রেণির মানুষের হক্ব বলেছেন (আত তাওবা, ৯/৬০)। যাকাত দাতাকে যাকাতের হক্বদারের নিকটেই তার যাকাত দিতে হবে। সেখানে সে নিজ স্বাধীনতা ব্যবহার করতে পারবে না। তবে যদি বোন যাকাতের হক্বদার হয় আর হক্ব হিসেবে তাকে দেওয়া হয়, তখন সে তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে মানুষকে দাওয়াত দিতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গোশত হাযির করা হলো। আমি বললাম, এটা বারীরাকে ছাদাকাহস্বরূপ দেওয়া হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা বারীরাহ'র জন্য ছাদাক্বা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপহার (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৯৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৪, ১০৭৫)।

প্রশ্ন (১৪) : আমাদের তিন বন্ধুর একটি ঔষধের দোকান আছে। বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার মতো ঔষধ আছে। এ দোকানের কি যাকাত দিতে হবে?

-শহীদুল ইসলাম
প্রবাসী, আল-মক্কা আল-মুকাররামা।

উত্তর : এই সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কেননা ৫ লক্ষ টাকার মালিক যদি তিনজনেই হয়, তাহলে প্রত্যেককেই যাকাত দিতে হবে। যাকাতের ব্যাপারে স্বর্ণ ও রূপার হিসাব করা হয়। স্বর্ণের হিসেবে ৫ লক্ষ আর রৌপ্যের হিসেবে প্রায় ৭০ হাজার টাকা হলেই তাতে যাকাত দিতে হবে। বর্তমান বাজারে ২০০ দিরহাম সমান প্রায় ৭০ হাজার টাকা আর ৭.৫ ভরি স্বর্ণ সমান প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

প্রশ্ন (১৫) : আমি একজন ছাত্র। পড়া-লেখার পাশাপাশি প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু টাকা জমিয়েছি। এই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

-শফিকুল ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রাইভেট পড়িয়ে যে টাকা জমা করেছেন তা নিসাব পরিমাণ হলে এবং পুরো এক বছর অতিবাহিত হলে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমার কাছে দুইশত দিরহাম থাকবে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে এমন অবস্থায় তুমি তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। আর যদি তোমার কাছে বিশ দিনার থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত আদায় করবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। অতএব রূপা হিসেবে প্রায় সত্তর হাজার এবং স্বর্ণের হিসেবে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা এক বছর পরিমাণ থাকলে তাতে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৬) : পিতা-মাতা দরিদ্র হলে তাদেরকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কি?

-রিয়াদ হোসাইন, মুন্সিগঞ্জ, সদর।

উত্তর : পিতা-মাতাকে যাকাতের মাল দেওয়া যায়েয নয়। কেননা সন্তান-সন্ততি এবং তাদের সম্পদ মূলত পিতা-মাতারই সম্পদ। আমর ইবনু শুআয়েব রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এসে বললো, আমার নিকট ধন-সম্পদ আছে এবং আমার পিতা দরিদ্রতার দরুন আমার ধন-সম্পদের মুখাপেক্ষী। তখন তিনি বললেন, তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার। তোমারদের সন্তান সন্ততিগণ তোমাদের উত্তম রিযিক্ব। সুতরাং তোমারা সন্তানের উপার্জন খাও' (আবূ দাঊদ, হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ, হা/২২৯২; আহমাদ, হা/৬৬৭৮; মিশকাত, হা/৩৩৫৪)।

উল্লেখ্য যে, পিতামাতা নিজ স্বাধীনতায় পরিমিতভাবে ছেলের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারবে। যদিও ছেলের সম্পদের ফারায়েজ অনুযায়ী মালিক ছেলে নিজেই।

প্রশ্ন (১৭) : জনৈক বিধবা মহিলা ১,৯০,০০০/= (এক লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা তিন বছর মেয়াদে পোস্ট অফিসে জমা রেখেছে এবং ১০০০/= (এক হাজার) টাকা মাসিক মুনাফা হিসাবে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা ইসলামী ব্যাংকে জমা রেখেছে এবং দেড় বিঘার মতো মাঠের আবাদি জমি আছে। এই সমস্ত আয় হতে সে কোনো রকম তার সংসার চালিয়ে নিচ্ছে। এখন তার উপর যাকাত দেওয়া ফরয হবে কি-না? যদি ফরয হয় তবে তার পরিমাণ কতটুকু?

-মিজান
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : প্রথমত, ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সূদ সুস্পষ্ট হারাম। ফিক্সড ডিপোজিট করা সুস্পষ্ট হারাম। কারণ আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন (আল বাকারা, ২/২৭৫)। তাই উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে তুলে উৎপাদনমূখী কোনো কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজনে বিশ্বস্ত কোনো লোকের সহযোগিতা নিবে। দ্বিতীয়ত, সাড়ে বায়ান্নো ভরি রৌপ্য কিংবা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মূল্য সমপরিমাণ টাকা হলে তাতে যাকাত ফরয হয় (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। যেহেতু রৌপ্যের মূল্য বিবেচনায় তার টাকা নিছাব পরিমাণ হয়ে গেছে, তাই তাতে শতকরা আড়াই টাকা তথা এক লক্ষে আড়াই হাজার টাকা হারে যাকাত দিতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)। আর আবাদি জমির ক্ষেত্রে ফসলের ওশর দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৮) : নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছরের মাঝে যে টাকা আয় হয়েছে সেগুলোর হিসাব ও যাকাতের হিসাব কিভাবে করব?

-উবায়দুল্লাহ
খুলনা।

উত্তর : যাকাতের হিসাব করার ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় জেনে রাখা জরুরী। আর তা হলো- (১) সম্পদ নেসাব পরিমান হওয়া (২) সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া। বিধায় যখন সম্পদ নেসাব পরিমান হবে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে তখন যাকাত আদায় করতে হবে। আর এ কথাও জেনে রাখা জরুরী যে, নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছরের মাঝে বা শেষের দিকে অথবা শুরুর দিকে যা কিছুই অর্জিত হোক না কেন তার যাকাত আদায় করতে হবে। এ মমে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমার কাছে দুইশত দিরহাম থাকবে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে এমন অবস্থায় তুমি তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। আর যদি তোমার কাছে বিশ দিনার থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত আদায় করবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

প্রশ্ন (১৯) : ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে কি?

-তাসকিয়া সিদ্দীক
রাঙ্গামাটি।

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যবহৃত স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, এক মহিলা আল্লাহর রাসূলের কাছে আসল, এমন অবস্থায় তার মেয়ের হাতে স্বর্ণের দুটি বালা ছিল। তা দেখে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় কর? উত্তরে সে বলল, না। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাকে কি এটা আনান্দ দিতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে ক্বিয়ামতের দিন আগুনের দুটি বালা পরাবেন। (এ কথা শুনে) সে বালা দুটি খুলে বলল, তা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য (আবূ দাঊদ, হা/১৫৬৩)। উম্মু সালামা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি পায়ে স্বর্ণের নূপুর ব্যবহার করতেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কানয বলে গন্য করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যা যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয়ে যায় এবং তাতে যাকাত দেওয়া হয় তা কানয বলে বিবেচিত হবে না (দারাকুৎনী, হা/১৯৭৩)। অত্র হাদীছে যাকাত দিতে হবে না এমনটি বলেননি। বরং বলেছেন, যার যাকাত আদায় করা হয় তা কানয বলে বিবেচিত হবে না। অতএব যাকাত আদায় করতে হবে। আর অলংকারের ক্ষেত্রে যাকাত নেই মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটিকে আলবানী রাহিমাহুল্লাহ যঈফ বলেছেন (জামেউছ ছাগীর, হা/১০৩৭৪)।

প্রশ্ন (২০) : প্রচলিত লুঙ্গি, শাড়ী কিনে যাকাত প্রদানের বিধান কি? যাকাতের টাকা দিয়ে সমাজে নলকূপ, কুঁয়া, রাস্তা-ঘাট তৈরি বা সংস্করণ করে দিলে যাকাত আদায় হবে কি?

-নাহিদ আলী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : যে সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে, সেই সম্পদ দিয়েই যাকাত বের করা জরুরী। যেমন : শস্যের যাকাত শস্য দিয়ে, প্রাণীর যাকাত প্রাণী দিয়ে, স্বর্ণের যাকাত স্বর্ণ দিয়ে এবং রৌপ্যের যাকাত রৌপ্য দিয়ে দিতে হবে। তবে ব্যবসায়িক পণ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু পণ্যের উপর যাকাত ফরয হয় না; বরং পণ্যের মূল্যের উপর যাকাত ফরয হয়, তাই ব্যবসায়িক পণ্যে টাকা দিয়েই যাকাত দিতে হবে। কিন্তু টাকার পরিবর্তে লুঙ্গি, শাড়ি দিয়ে যাকাত দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি মূলত যাকাতে ফাঁকি দেওয়ার নামান্তর। কারণ এর মাধ্যমে নামকাওয়াস্তে কিছু লুঙ্গি-শাড়ি মানুষকে দেখানো হয় যে, সে যাকাত দিচ্ছে। এর মাধ্যমে অভাবীর কোন কল্যাণ হয় না। আবার তাদের পছন্দ মতো কাপড়টিও তারা নিতে পারে না। সম্পদ ব্যক্তিগতভাবে পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে সরকারীভাবে পরিবর্তন করে সেটি দিয়ে নলকূপ কুয়া, রাস্তাঘাট ইত্যাদী তৈরি করতে পারবে।

প্রশ্ন (২১) : বিগত কয়েক বছর আমি যাকাত প্রদান করিনি। এখন আমার করণীয় কী?

-সোলায়মান
বরিশাল।

উত্তর : যাকাত একটি ফরয ইবাদত। অলসতা কিংবা কৃপণতাবশত যাকাত আদায় না করলে যাকাত মওকূফ হয় না। বরং তার কাযা আদায় করা জরুরী। কারণ তা বান্দার হক। তাই পূর্বের বছরগুলোতে সম্পদের পরিমাণ কত ছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা থাকলে সেই অনুসারে অথবা নির্দিষ্ট হিসাব না থাকলে আনুমানিক হিসাব ধরে তার যাকাত আদায় করে দেওয়া জরুরী (মাজমূউল ফাতাওয়া লি ইবনি উছায়মীন, ১৮/৩০২)। আর এর জন্য রমাযান মাসের অপেক্ষা করা যাবে না। বরং সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন (২২) : প্রভিডেন্ট ফান্ড ও কল্যাণ তহবিলের টাকার উপর যাকাত দিতে হবে কি?

-আকবার আলী
ঢাকা, উত্তরা।

উত্তর : যাকাত দিতে হবে একথাই ঠিক। যদি তা উঠানো সম্ভব হয় তাহলে উঠিয়ে অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে যাকাত দিবে না। যখন টাকা উত্তলন করবে তখন শুধু এক বছরের যাকাত আদায় করে দিবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে বিধান চাপিয়ে দেন না' (আল-বাক্বারা, ২/২৮৬)।

প্রশ্ন (২৩) : স্ত্রী তার নিজস্ব স্বর্ণালাঙ্কারের যাকাত স্বামীর থেকে টাকা নিয়ে প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে কি?

-সিজান
মেহেরপুর।

উত্তর : স্ত্রী তার নিজস্ব স্বর্ণালাঙ্কারের যাকাত আদায় করার ক্ষেত্রে নিজের টাকা হতেই দিবে। কারণ হাদীছে এমনটি

বলা হয়েছে যে, যদি তোমার দুইশ দিরহাম থাকে এবং পূণ এক বছর তাতে অতিবাহিত হয় তাহলে তাতে পাচঁ দিরহাম যাকাত আদায় করবে (আবূ দাউদ, হা/১৫৭৩)। অত্র হাদীছে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, অন্য কারো দিকে নয়। তবে স্বামী যদি খুশি মনে দিয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তবুও এমন অবস্থা হতে বিরত থাকাই ভালো। কারণ এতে স্বামীর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রশ্ন (২৪) : অন্য মাসের চেয়ে রামাযান মাসে যাকাত বের করার কোনো গুরুত্ব ও ফযীলত আছে কি?

-আবু আব্দুল্লাহ
নাটোর।

উত্তর : রামাযান মাসে যাকাত বের করা ভলো তবে নির্ধারিত সময়েই যাকাত দেওয়া উত্তম। যাকাতের কয়েকটি নিয়ম আছে। তা হলো, পুরো এক বছর অতিবাহিত হলেই যাকাত দেওয়া ফরজ। কিন্তু ফসলের ক্ষেত্রে ফসল তোলার দিন ওশর বের করতে হবে। রামাযানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তোমরা ফসলের হকসমূহ আদায় করো যেদিন ফসল কর্তন কর সেদিনই (আল আনআম, ৬/১৪১)। তবে নিসাব পরিমাণ সম্পদে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেও যাকাত দেওয়া যাবে। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর নিকট আগাম যাকাত দেওয়ার আবেদন করলে তিনি তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দেন (তিরমিযী, হা/৬৭৮; আবূ দাঊদ, হা/১৬২৪; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৯০)। রামাযান মাসে যাকাত আদায় করার ফযিলত: রমাযানে যাকাত বের করার বিশেষ কোন ফযিলত নেই। কেননা যাকাত একটি ফরয বিধান, যার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। সস্য ব্যতীত প্রতিটি সম্পদে এক বছর পুর্ণ হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। অবশ্য যাকাত সময়ের আগেও দেওয়া যায়। কেউ যদি রহমত ও বরকতের আশায় রমাযানকে নির্ধারণ করে দুই এক মাস আগেই যাকাত প্রদান করে তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২৫) : ফিতরা কত তারিখে দেওয়া সুন্নাত?

-আব্দুর রহমান
ঝিনাইদাহ।

উত্তর : ঈদের ছালাতে বের হওয়ার পূর্বে ফিতরা বের করতে হবে। তবে ঈদুল ফিতরে এক বা দুইদিন পূর্বে বের করা যাবে। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকেরা ছালাতের উদ্দেশ্যে (ঈদগাহে) যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে ছাদাকাতুল ফিতর প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নাফি’ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু ঈদের একদিন ও দুইদিন পূর্বেই তা প্রদান করতেন (আবূ দাঊদ, হা/১৬১০,১৬১২)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ঈদের ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, ১৫০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪; আহমাদ, হা/৬৫৪১)।

প্রশ্ন (২৬) : পরিবারের সকল মহিলার স্বর্ণ একত্র করলে যাকাত পরিমাণ হয়। এখন করনীয় কি? যাকাত দিতে হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর : পরিবাবের সকল মহিলার অভিভাবক যদি একজন হন এবং সেই স্বর্ণ উক্ত অভিভাবকের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে একত্রে যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে স্বর্ণ একত্রিত করে যাকাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে এককভাবে কারো যদি স্বর্ণ যাকাতের নেসাব পরিমান হয়ে থাকে তাহলে তাতে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। এ মর্মে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমার কাছে দুইশত দিরহাম থাকবে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে এমন অবস্থায় তুমি তাতে পাচঁ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। আর যদি তোমার কাছে বিশ দিনার থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত আদায় করবে (আবূ দাউদ, হা/১৫৭৩)।

প্রশ্ন (২৭) : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অর্থের উপর যাকাতের বিধান কি?

-মিজান
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : পরিবার ও সন্তানদের আহার যোগাতে গিয়ে ঋণগ্রস্থ হলে তা পরিশোধের পরে যাকাত দিতে হবে। উছমান উবনু

আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটা তোমাদের যাকাতের মাস। অতএব যার উপর ঋণের বোঝা আছে সে যেন আগে তা পরিশোধ করে। তারপর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে যাকাত আদায় করে (মুয়াত্তা মালেক, হা/৯৭৩)। আর যদি ব্যবসা বাণিজ্য ও বাড়ি গাড়ির জন্য ঋণ নিয়ে থাকে যা সমাজে প্রচলিত আছে তাহলে তার মূল সম্পদ নিসাবে পৌঁছলেই যাকাত দিতে হবে। আর এভাবে ঋণ নেওয়া জায়েযও নয়।

ছিয়াম

প্রশ্ন (২৮) : দীর্ঘ দিনের ফরয ছিয়াম বাকি রয়েছে যার সংখ্যা আমি জানি। উক্ত ছিয়ামগুলো কি ক্বাযা করব না-কি ফিদিয়া দিব?

-জাহাঙ্গীর আলম
উত্তরামপুর, নওগাঁ।

উত্তর : দীর্ঘদিন ধরে ছিয়াম ছেড়ে আসছেন। সত্যই যদি নিশ্চিভাবে সেগুলোর সংখ্যা জানা থাকে, তাহলে অবশ্যই সেগুলোর একটি ছিয়ামের বদলে একটি ক্বাযা করতে হবে। স্বেচ্ছায় ছিয়াম ছেড়ে দিলে একটি ছিয়ামের বদলে একটিই ক্বাযা করতে হয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, কোন লোকের ছিয়াম থাকাবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে সে লোককে ঐ ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু কোন লোক ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তাকে কাযা আদায় করতে হবে (তিরমিযী, হা/৭২০)। তবে বিগত দিনের ছিয়ামের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে তার কাযা আদায় করবে না। এক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মানুষ বিনয়ী হয়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

প্রশ্ন (২৯) : আমার বয়স ৫০ বছর। বিগত জীবনে আমি যাকাত ও ছিয়াম পালন করিনি। তবে এখন করি এবং ভবিষ্যতেও করবো ইনশা-আল্লাহ। বিগত জীবনের যাকাত ও ছিয়ামগুলো কি আদায় করতে হবে না-কি তওবা করলে হবে?

-মিজানুর রহমান
পীরগঞ্জ, নাটোর।

উত্তর : যাকাত আদায়ের বিলম্ব করার কারণে নিঃসন্দেহে সে পাপী হবে। তাই তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। তার উপর অবশ্যক হচ্ছে যেসব বছরের সে যাকাত আদায় করেনি সেই বছরগুলোর হিসাব করে একত্রে দ্রুত যাকাত আদায় করা (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং- ৩৬০)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি। ক্বিয়ামতের দিন তার সম্পদ টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দুপার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল (ছহীহ বুখারী, হা/১৪০৩)। ছিয়ামের জন্য ক্ষমা চাইবে আর যাকাত দেওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। যদি দিতে না পারে তাহলে সেক্ষেত্রেও ক্ষমা চাইবে।

প্রশ্ন (৩০) : ঘুমিয়ে থাকার কারণে ইফতারির সময় ৩০ মিনিট পার হয়ে গেছে এখন করণীয় কী?।

-আসাদুল্লাহ, ঢাকা।

উত্তর : যখন ঘুম ভাঙবে তখনই তাকে ইফতার করতে হবে। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, তিনি ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না জ্ঞানসম্পন্ন হয়। (আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)। ছালাতের ব্যাপারেও নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا কেউ ছালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে নিবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৮০)।

প্রশ্ন (৩১) : ছিয়াম থাকাবস্থায় দিনের বেলায় টুথপেষ্ট ব্যবহার করে ব্রাশ করা যাবে কি?

-সাজ্জাদুল কারীম, ঢাকা।

উত্তর : ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক বা দাঁতন করা যায়। মিসওয়াক করা যাবে না মর্মে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে, তা সঠিক নয়। বরং টুথপেষ্ট কিংবা মাজন দিয়ে, কাঁচা অথবা শুকনা ডাল দ্বারা ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করা যাবে। এমতাবস্থায় মিসওয়াক কিংবা টুথপেষ্ট, মাজনের স্বাদ আস্বাদন অনুভব হলেও ছিয়ামের ক্ষতি হবে না। কুরআন ও হাদীছে ওযূর সময় দাঁতন ব্যবহার করাতে কোন নিষেধ বর্ণিত হয়নি। তবে ওযূতে নাকে পানি দেওয়ার বিষয়ে সাবধানতার কথা রয়েছে।

স্বজোরে নাকে পানি টান দেওয়া যাবে না। আমের ইবনু রাবী'আহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ছিয়াম থাকবস্থায় অসংখ্য বার মিসওয়াক করতে দেখেছি। আবূ হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার ওযূর সময়ই আমি তাদের মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ ইবনু খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি ছিয়ামপালনকারী এবং ছিয়ামপালনকারী নয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। 'আত্বা রাহিমাহুল্লাহ এবং কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ছিয়ামপালনকারী তার মুখের থুথু গিলে ফেলতে পারে (ছহীহ বুখারী, ৩য় খ. পৃ.৩১; ছিয়াম অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩২) : গর্ভবতী থাকার কারণে অনেকগুলো ছিয়াম রাখতে পারিনি। পরবর্তীতে ছিয়াম ক্বাযা করার ইচ্ছা করেও রাখতে পারিনি। পরের বছর সন্তানকে দুধ পান করানোর কারণে ছিয়াম রাখতে পারিনি এবং এখনো আমি অসুস্থ। প্রশ্ন হলো- পূর্বের ছিয়ামগুলোর ব্যাপারে সমাধান জানতে চাই।

-আলতাফ, রায়পুরা, নরসিংদী।

উত্তর : এমতাবস্থায় আপনার ছুটে যাওয়া অতীতের ছিয়ামগুলোর জন্য ফিদিয়া হিসেবে প্রতিদিন সোয়া কেজি চাউল দিতে হবে। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী, "যারা সামর্থবান (কিন্তু ছিয়াম পালনে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে ফিদিয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দিবে' (আল-বাক্বারা, ২/১৮৪)। তিনি বলেন, এ আয়াতে অতিবৃদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য ছিয়াম ভঙ্গের বিধান রয়েছে। এরা উভয়ে যখন ছিয়াম পালনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এমতাবস্থায় ছিয়াম না রেখে প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাবার দিবে। গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের জন্যেও ছিয়াম ভঙ্গের অনুমতি আছে (আবূ দাউদ, হা/২৩১৮)।

প্রশ্ন (৩৩) : আমরা জানি ই'তিকাফ করা সুন্নাত। প্রশ্ন হলো- ই'তিকাফের জন্য মসজিদে প্রবেশের সময় কখন?

-আসাদুল হক
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তর : ২০ রামাযান অতিবাহিত হওয়ার পর মাগরিবের পর ই'তিকাফে প্রবেশ করবে। কারণ শেষ দশক আরম্ভ হয় ২০ রামাযানের সূর্য ডুবার পর হতে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৭২; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১২০)। আর ২১ তারিখ ফজর পর হতে ই'তিকাফকারী সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মশগূল থাকবে (ছহীহ মুসলিম, মিশকাত, হা/২১০৪; ফাতাওয়া ইবনু উছায়মীন, ২০/১৭০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন (৩৪) : রমাযান কেন্দ্রিক বিদ'আতগুলো জানতে চাই।

-আব্দুল মুক্বীত
ঢাকা।

উত্তর : রামাযান মাসে অনেক বিদ'আত আমল করা হয়। অথচ আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এদিনে নতুন উদ্ভবন করেছে যা এতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত (বুখারী, হা/২৬৯৭; মুসলিম, হা/১৭১৮)। নিম্নে কিছু বিদআত উল্লেখ করা হলো:

(১) ইফতারের সময় দলবদ্ধভাবে দুই হাত তুলে দুআ করা। (২) রামাযান মাসে শেষ শুক্রবার দলবদ্ধভাবে কবরস্থানে কবর যিয়ারত করা। (৩) ইফতারের সময় দেরী করে ইফতার করা। (৪) তারাবী ছালাতের শেষে দলবদ্ধভাবে দুআ করা। (৫) ঈদের মাঠে কয়েকটি খুৎবা দেওয়া। (৬) ঈদের ছালাতের পর কয়েকটি হাত তুলে মুনাজাত করা। (৮) মৃত্য ব্যক্তির নামে ইফতারের আয়োজন করা।(৯) নির্দিষ্টভাবে ঈদের দিন দলবদ্ধ হয়ে কবর যিয়ারত করা। এছাড়াও আরো অনেক বিদ'আত রয়েছে, যেগুলো রামাযান মাসে করা হয়। অথচ এগুলো পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদেরকে বিদআত থেকে দুরে রাখুন। আমিন!

হালাল হারাম

প্রশ্ন (৩৫) : শরীর চর্চার জন্য ক্রিকেট, ফুটবল খেলা যাবে কি?

-শিহাব
ময়মনসিংহ।

উত্তর : ক্রিকেট, ফুটবল বা এ জাতীয় খেলা কিছু শর্তের ভিত্তিতে তা খেলা যেতে পারে। শর্তগুলো হলো, (ক) জুয়া মুক্ত হওয়া। (খ) আল্লাহর যিকর-আযকার, ছালাত, ছিয়াম

ইত্যাদি থেকে ব্যক্তিকে ব্যস্ত রাখবে না। (গ) সতর আলগা করা, নারী-পুরুষ একাকার হয়ে যাওয়া, ঢাক-ঢোল, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র, পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন বিষয় সেগুলোতে থাকবে না। (ঘ) হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে এবং সেগুলোতে শারীরিক ও মানসিক কোন ক্ষতি থাকবে না। (ঙ) সময় ও অর্থ অপচয় হওয়া যাবে না (ফৎওয়া-লাজনা দায়েমা, ১৫/১৯৪, ২৩৯ পৃ.)। তবে, এসব শ্রমনির্ভর খেলা যদি শরীর চর্চা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, রোগ-বালাই নাশ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেগুলো জায়েয; বরং মুস্তাহাব (ফৎওয়া রাসায়েলুশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম, ৮/১১৮ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩৬) : আমি একটা জব করি। সেখানে নিকোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য কর্মচারীদের সিগারেট দেওয়া হয়। আমি তা বিক্রি করে অন্য কিছু কিনে খাই বা আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করি। এমনটি করা কি শরীয়তসম্মত হচ্ছে? না হলে করনীয় কী?

-আব্দুল কায়্যুম, গাইবান্ধা।

উত্তর : নিকোটিন হলো তামাকপাতা থেকে প্রাপ্ত একরকম বিষাক্ত বর্ণহীন উপক্ষার। এক কথায় মাদক বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ মদ খাওয়া হারাম করেছেন। তিনি বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জেনে রাখো, নিশ্চয় মদ, জুয়া, লটারী, ও ভাগ্যনির্ধারনী তীরসমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম (আল মায়েদা, ৫/৯০)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্য হারাম' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৩; আবূ দাঊদ, হা/৩৬৭৯)। সুতরাং কর্মচারীদের ক্লান্তি দূর করার জন্য মাদক পরিবেশন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো না' (আল মায়েদা, ৫/২)। আর কোনো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের মাদকদ্রব্য পরিবেশন করে থাকলে তা গ্রহণ করা যাবে না বা গ্রহণ করলেও তা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে, কারো নিকট বিক্রি করে এর মূল্য ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণির মানুষকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন। তার এক শ্রেণির লোক হলো, যে মদ বিক্রি করে (তিরমিযী, হা/১২৯৫; মিশকাত, হা/২৭৭৬)।

প্রশ্ন (৩৭) : মেহের জাইন, জাইন বিখা, আহমেদ বুখাতির যেসব নাশিদ গায় তা শুনা কি ঠিক হবে? শিরোনামে 'নো মিউজিক' লেখা থাকলেও তাতে এক ধরনের বাজনা থাকে।

-রাকিব হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নাশীদ ও গজলে মিউজিক তথা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হিসাবে যে সাউন্ড ব্যবহার করা হচ্ছে তা বাদ্যযন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং এমন ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড যুক্ত নাশীদ ও গজল শোনা যাবে না। কেননা ইসলামে বাদ্যযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে হারাম। কুরআনে এগুলোকে لَهْوَ الْحَدِيْثِ অনর্থক কাজ/জিনিস হিসাবে বলা হয়েছে (লুকমান, ৩১/৬)। আবূ মালেক আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড় মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে' (অথচ তা হারাম) (ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০; বুলূগুল মারাম, হা/৫২৪)। অপর বর্ণনায় রয়েছে- আবূ মালেক আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের কতক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ তাআলা এদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন (ইবনু মাজাহ, হা/৪০২০)।

প্রশ্ন (৩৮) : হাদীছে রয়েছে, কুকুর পালন করলে প্রতিদিন ১ ক্বেরাত ছওয়াব কমে যায়। আমার স্ত্রী একটি কুকুরের বাচ্চাকে নিয়মিত খাবার দিত। এই সুবাদে আমিও দিতাম। এখন কুকুরটি বড় হয়েছে এবং আমার বাড়ি ছাড়ছে না। এতে কি আমার ছওয়াব কমে যাবে এবং গুনাহ হবে? যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমার করনীয় কী?

-হাবিবুর রহমান শিমুল
রায়পুর, লক্ষীপুর।

উত্তর: যে কোনোভাবেই হোক কুকুরটিকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। কেননা, বিনা প্রয়োজনে শখের বশে কুকুর পালন করা যাবে না। করলে বাড়িতে

রহমতের ফেরেশতা আসবে না ও প্রতিদিন নিজের নেকী থেকে এক ক্বেরাত নেকী কমে যাবে। তবে বাহিরে থাকা ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাবার প্রদান করা যাবে। আবূ ত্বালহা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ঘরে কুকুর ও প্রাণির ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩২২৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৬)। তবে সস্যক্ষেত ও শিকারের জন্য যদি কুকুরটি লালনপালন করা হয় তাহলে তাতে সমস্যা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিকার করা, গবাদী পশু দেখাশুনা ও ক্ষেত-খামার দেখাশুনা করা ব্যতীত কুকুর পালন করবে, তার নেকী থেকে প্রতিদিন এক কেরাত নেকী কমে যাবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৫)।

প্রশ্ন (৩৯) : আমি ফুড ডেলিভারি বয় হিসাবে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করি। ছিয়াম ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তির নিকট রমাযান মাসে দিনের বেলায় খাবার ডেলিভারি করতে হয়। এমন ব্যক্তির নিকট খাবার ডেলিভারি করা বৈধ হবে কি? আর ঐ ডেলিভারির টাকা হালাল হবে কি?

-যোবায়ের ইসলাম
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যে ব্যক্তির ওপর ছিয়াম পালন করা ফরয এমন ব্যক্তি যদি রমাযান মাসে দিনের বেলায় খাবার ডেলিভারী চায় তাহলে তাকে ডেলিভারি দেওয়া যাবে না। কেননা এতে তাকে হারাম ও শরীআত বিরোধী কাজে সহায়তা করা হবে যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না (আল মায়েদা, ৫/২)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই (তিরমিযী, ৪/২০৯)।

প্রশ্ন (৪০) : আমাদের মোবাইল ফোনে যে গেমসগুলো থাকে যেমন. গাড়ির গেমস, মটরসাইকেলের গেমস ইত্যাদী। এই গেমসগুলো খেলা বা এই গেমসগুলোর সফটওয়্যার বানানো জায়েয হবে কি?

-মুবাশ্বিরা, বুশরা
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, জায়েয হবে না। কেননা, মোবাইল ফোনের গেমসহ যে সকল খেলা-ধুলায় সময় নষ্ট হয়, বাজি ধরা হয় তার সবটাই হারাম। বাজি ধরে খেলা করা জুয়ার অন্তর্ভূক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! জেনে রাখো, মদ, জুয়া, লটারী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর এ সবই শয়তানের অশ্লীল কর্ম। অতএব, তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তোমাদের মাঝে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেশ ছড়াতে চায় এবং আল্লাহর যিকির ও ছালাত আদায় করতে বাধা সৃষ্টি করতে চায়। অতএব, তোমরা কি এগুলো থেকে বিরত হবে না' (আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)। সুলায়মান ইবনু বুরায়দা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নারদাশীর (পাশা বা এমন খেলা যাতে শারিরিক ও শরীয়তের কোন কল্যাণ নেই) খেলবে, সে যেন তার হাতকে শুকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করলো' (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৩৯)। আর শরীয়তের মূলনীতি হলো: হারাম কাজে সহযোগিতা করা হারাম। শরীয়ত বহির্ভূত গেম খেলা না জায়েয। সুতরাং গেম খেলার জন্য অ্যাপ বা সফটওয়্যার বানানো জায়েয হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পরস্পর কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪১) : বর্তমানে কিছু অনলাইন কোম্পানি আছে যারা (ভাউচার বিক্রয় করে অর্ধেক দামে, যেমন -১০,০০০ টাকার ভাউচার কিনতে হলে ৫,০০০ টাকা ব্যয় করতে হবে।) এই ১০,০০০ টাকার ভাউচার দিয়ে ঐ কোম্পানির সাইট থেকে পণ্য কেনা যাবে। এটা কি হালাল হবে? না-কি হারাম?

-ফজলে রাজীব
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : অর্ধেক দামে ভাউচার কেনা 'টাকার বিনিময়ে টাকা কেনা'-র শামিল। যা স্পষ্ট সূদ। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময়ে লবনের লেনদেন সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে।

যদি কেউ বেশি দেয় বা বেশি চায় তাহলে সে সূদ গ্রহণ করল। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা দুজনেই সমান পাপী’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৮৪; মিশকাত, হা/২৮০৯)। তাই ভাউচারে লিখিত টাকার চেয়ে কম দামে ভাউচার কেনা হলে তা সূদ হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রত্যেক যে ঋণে মুনাফা বা লাভ নিয়ে আসে তাই হলো সূদ’ (সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, ৫/৫৭১)।

প্রশ্ন (৪২) : অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করা হালাল না হারাম?

-শেখ ইসমাইল
পূর্ব বর্ধমান, ভারত।

উত্তর : প্রচলিত অলিম্পিক গেমস, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ এতে বহু শারঈ নীতিমালা লঙ্ঘিত হয়। যেমন- খেলোয়াড়দের সতর (আব্রু) খোলা থাকে। নারী খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ থাকে। সেটা আবার সারা বিশ্বে দেখানো হয়। নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারী দর্শকের অবাধ অংশগ্রহণ থাকে। খেলার নামে চলে আধুনিক জুয়ার রমরমা ব্যবসা। দেশ-বিদেশ থেকে আগত খেলোয়াড়-দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য চলে মদ ও নারীর দেহ ব্যবসা। তাই এসব খেলা জায়েয হওয়ার কোনো দিকই থাকে না। এটি একটি জুয়া। সুলায়মান ইবনু বুরায়দা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নারদাশীর (পাশা বা এমন খেলা যাতে শারিরিক ও শরীয়তের কোন কল্যাণ নেই) খেলবে, সে যেন তার হাতকে শুকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করলো’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬০; আবূ দাঊদ, হা/৪৯৩৯)।

প্রশ্ন (৪৩) : বর্তমান অনলাইন বিজনেস SPC Express World সম্পর্কে ইসলামি শরীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

-আহসান হাবীব
শ্রীপুর, গাজীপুর।

উত্তর : এস পি সি (SPC World Express Ltd.) মূলত নতুন মোড়কে পূর্বের ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেডের অনলাইন রূপ। বিভিন্ন কারণে এসব কোম্পানির কার্যক্রম জায়েয নয়। যেমন- ১. এতে এমন সব লোকেরা বিজ্ঞাপনগুলো দেখে থাকেন, যাদের উক্ত পণ্যটি কেনার কোনো ইচ্ছে নেই। বরং ক্রেতার কাছে উক্ত পণ্যটির চাহিদা দেখানোর জন্য ভিউ বেশি বুঝাতে ক্লিক করে ভিউ বাড়ানো হয়ে থাকে, যা মূলত ক্রেতার সাথে এক প্রকার প্রতারণা; যা জায়েয নয়। ২. এসব বিজ্ঞাপনে নারীদের ছবি প্রদর্শন হয়ে থাকে, যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কারণে চোখের যেনা হয়ে থাকে। ৩. এতে এমএলএম এর মতো নাজায়েয বিষয় শামিল আছে, যা অনেকগুলো কারণে নাজায়েয। যেমন- (ক) এতে কেউ কর্ম ছাড়াই পারিশ্রমিক পায়। (খ) কেউ কর্ম করেও পারিশ্রমিক পায় না। (গ) ধোঁকা ও প্রতারণার সুযোগ আছে। (ঘ) এক চুক্তিতে একাধিক চুক্তি শামিল। মূল কথা এমন ব্যবসায় বিভিন্ন স্তরে প্রতারণা রয়েছে। আর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (সব ধরনের) প্রতারণা নিষিদ্ধ (মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৪০৫)।

প্রশ্ন (৪৪) : আমি একটি ঠিকাদারী কোম্পানিতে সাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত আছি। এই সাইটের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ডিপার্টমেন্টগুলো দুর্নীতির সাথে জড়িত। একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দুর্নীতিযুক্ত কাজগুলো আমাকে বাস্তবায়ন করতে হয়। আমার উপার্জন হালাল হবে কি?

-মো. সোহানুর রহমান
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : ঠিকাদারী কোম্পানিটি যদি মূলে হারাম থেকে মুক্ত হয় এবং দুর্নীতির সাথে জড়িত না হয় অথবা সরকারি ডিপার্টমেন্টগুলো থেকে সুবিধাভোগী না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টগুলোর দুর্নীতির জন্য ঠিকাদারী কোম্পানি দায়ী থাকবে না। কারণ কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না (আয-যুমার, ৩৯/৭)। আর সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত উপার্জন হারাম হবে না। তবে কোম্পানি যদি দুর্নীতির সুবিধাভোগী হয় তাহলে অন্যায় কাজে কাউকে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, ‘পূণ্য ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও আল্লাহদ্রোহিতার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। এমতাবস্থায় সেই উপার্জন হালালও হবে না।

পারিবারিক বিধান

প্রশ্ন (৪৫) : অনলাইনে ইসলামী বই-পুস্তক বিক্রয় করতে করতে একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয় এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা হয়। অবশেষে তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তার পরিবারের সম্মতিতে বিবাহ করি। এই বিবাহ কি বৈধ হবে?

-মোস্তফা শাকিল
চুয়াডাঙ্গা সদর।

উত্তর : যেহেতু অভিভাবকের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছে তাই বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পূর্বের কাজগুলো গর্হিত অপরাধ। তাই অনুতপ্ত সহকারে কান্না করে সেগুলোর জন্য তাওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (৪৬) : সন্তানের আক্বীকা দেওয়ার দায়িত্ব পিতা-মাতার। এখন হবু সন্তানের জন্য আক্বীকার নির্ধারিত পশু সন্তানের নানা-নানী আক্বীকা দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লালন-পালন করে দেয়। এমন পশু দ্বারা আক্বীকা দিলে আক্বীকা হবে কি? না কি পিতার দায়িত্ব হিসাবে লালন-পালনের বিনিময় দিয়ে দিতে হবে?

-বন্যা খাতুন
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকা করতে হয় (আবূ দাঊদ, হা/২৮৩৭; মিশকাত, হা/৪১৫৩)। আর সাধারণভাবে এর দায়িত্ব পিতার উপর বর্তায়। কিন্তু কোনো আত্মীয় যদি স্বেচ্ছায় আক্বীকার পশু লালন-পালন করে দেয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে বাচ্চার নানা-নানীকে পশু পালনের জন্য চাপ দেওয়া হলে তা যৌতুক বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন (৪৭) : সম্প্রতি আমি জানতে পারলাম যে, কেউ কোনো নারীকে বিবাহের পূর্বে নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বললে বিবাহের পর উক্ত নারী তালাক হয়ে যাবে। ১. আমি যাকে বিবাহ করব সে তালাক, ২. বিবাহের পর আমার স্ত্রী অমুক কাজ করলে তালাক, যখন তোমাকে বিবাহ করব তখন তুমি তালাক ইত্যাদী। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-সুমাইয়া খাতুন
কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে কেউ এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করলে বিবাহের পর তালাক্ব কার্যকর হবে না। কেননা, মালিকানাবিহীন বিষয়ের মধ্যে ক্ষমতা খাটে না। আমর ইবনু শু'আইব রাহিমাহুল্লাহ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তান যে সকল জিনিসের মালিক নন সে সকল জিনিসের মানত জায়েয নয়, সে যার মালিক নয় তাকে সে মুক্তি দিতে পারে না এবং তার সাথে যার বিয়ে হয়নি তাকে সে তালাকও দিতে পারে না। (তিরমিযী, হা/১১৮১; মিশকাত, হা/৩২৮২)। মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহরে পূর্বে তালাক কার্যকর হবে না এবং মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে গোলাম আযাদ হবে না' (ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৮)।

প্রশ্ন (৪৮) : স্ত্রীকে নগদ মোহরনা প্রদান না করে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা বৈধ হবে কি?

-নুরুজ্জামান
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ করা বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ রুকুন। কেউ যদি স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ না করার ইচ্ছা রাখে তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ হবে না বরং যেনা হবে। উক্ববা ইবনু আমের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা উচিত, তন্মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হলো যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল করো অর্থাৎ মোহরানা (ছহীহ বুখারী, হা/২৭২১, ৫১৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৮; মিশকাত, হা/৩১৪৩)। সুতরাং বিয়ের বৈঠকে মোহরানা প্রদান করুক বা পরে করুক স্বামীকে অবশ্যই স্বীয় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতেই হবে। উল্লেখ্য যে, মোহরানা বিবাহ পরবর্তী সময়ে পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে বিবাহ ও সংসার করা জায়েয রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও (আন-নিসা, ৪/২৪)। অত্র আয়াতে সংসার পরবর্তীতে মোহরানা পরিশোধ করা যায় তা বুঝা যায়। এছাড়াও বুখারী, ৫০৩০, ছহীহ মুসলিম, ১৪২৫ হাদীছেও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

দুআ/ প্রার্থনা

প্রশ্ন (৪৯) : আমরা জানি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার সকাল সন্ধায় পড়তে হয়। প্রশ্ন হলো, এখানে সকাল আর সন্ধ্যা বলতে ফজরের আর মাগরিবের পর বুঝানো হয়েছে?

-আরাফাত ইসলাম ওরনাব
ক্যান্টনমেন্ট ঢাকা-১২০৬।

উত্তর : সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার শুধু সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করা খাছ নয়। বরং রাত-দিনের যে কোনো সময় পড়া যেতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে সাইয়্যেদুল

ইস্তিগফার দিবসে পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে, সে ব্যক্তি জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ইয়াক্বীনের সাথে সাইয়েদুল ইস্তিগফার রাতে পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সেও জান্নাতীদের অন্তর্ভূক্ত হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৬)। অন্য বর্ণনায় বলেছেন, যদি কেউ সাইয়েদুল ইস্তিগফার সন্ধ্যায় পড়ে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনুরূপভবে সকালে পড়ে সে দিনের যে কোনো সময় মারা গেলেও জান্নাতে প্রবেশ করবে (ছহীহ বুখারী, হা/ ৬৩২৩)। আর যেসব হাদীছে সকাল-সন্ধ্যার কথা বলা হয়েছে, সেখানে সকাল দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো-ফজর ছালাত হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো- আছরের ছালাত হতে মাগরিব পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ দলীল হিসাবে বলেছেন, আল্লাহর বাণী, 'তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করো' (আল-আহযাব, ৩৩/৪২)। 'তুমি সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তোমার রবের প্রশংসার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে থাকো' (ক্বফ, ৫০/৩৯)।

প্রশ্ন (৫০) : বৃষ্টির সময় দু'আ কবুল হয়। এটা কি সত্য?

-সাকিলা জাহান
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : জী; বৃষ্টির সময়ে দু'আ কবুল হয় একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সাহল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুই সময়ের দু'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না অথবা তিনি বলেছেন কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১. আযানের সময়ের দু'আ ২. বৃষ্টি বর্ষণের সময়ের দু'আ (জামে'উল আহাদীছ, হা/১১৩২৪; বায়হাক্বী, হা/৬৬৯০; কানযুল উম্মাল, হা/৩৩৩৮; মিশকাত, হা/৬৭২)।

بسم الله الرحمن الرحيم

**নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন**

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

**আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ,
জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

**পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ
বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :**
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্‌মুখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৮৭-০২৫০৬০, ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৭ থেকে ১২ বছর বয়সী ছোটদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট
মূল্য: ১০০০ টাকা
সাইজ: ৭.৭৫*৮.৭৫"

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। গল্পে গল্পে সোনামণিরা এবার জেনে যাবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বর্ণাঢ্য জীবনী, যারা ছিলেন এই উম্মাহর সেরাদের সেরা।

'আমার প্রথম পাঠাগার' সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট
মূল্য: ৯০০ টাকা
সাইজ: ৩.৫*৪"

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন অ আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে জয়েন করুন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ কিতাবিয়ান-এ!
লিংক- https://www.facebook.com/groups/kitabiyan

sondiponbd
www.sondipon.com
sondiponprokashon@gmail.com
01779 19 64 19 ,01406 300 100
34, Madrasa Market (1st Floor), Banglabazar

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

Monthly Al-Itisam الإعتصام 6th Year, 6th Part, April 2022, Price : 25.00

সাহারী ও ইফতারের সময়সূচি

হিজরী : ১৪৪৩, বঙ্গীয় : ১৪২৮-১৪২৯

ঢাকার জন্য

তারিখ		বার	সাহারীর শেষ সময় ঘণ্টা-মিনিট	ইফতারের সময় ঘণ্টা-মিনিট
হিজরী	খ্রিষ্টাব্দ			
০১ রামাযান	০৩ এপ্রিল	রবিবার	৪ : ৩২	৬ : ১৫
০২ রামাযান	০৪ এপ্রিল	সোমবার	৪ : ৩১	৬ : ১৬
০৩ রামাযান	০৫ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪ : ৩০	৬ : ১৬
০৪ রামাযান	০৬ এপ্রিল	বুধবার	৪ : ২৯	৬ : ১৭
০৫ রামাযান	০৭ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	৪ : ২৮	৬ : ১৭
০৬ রামাযান	০৮ এপ্রিল	শুক্রবার	৪ : ২৭	৬ : ১৭
০৭ রামাযান	০৯ এপ্রিল	শনিবার	৪ : ২৬	৬ : ১৮
০৮ রামাযান	১০ এপ্রিল	রবিবার	৪ : ২৪	৬ : ১৮
০৯ রামাযান	১১ এপ্রিল	সোমবার	৪ : ২৩	৬ : ১৯
১০ রামাযান	১২ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪ : ২২	৬ : ১৯
১১ রামাযান	১৩ এপ্রিল	বুধবার	৪ : ২১	৬ : ১৯
১২ রামাযান	১৪ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	৪ : ২০	৬ : ২০
১৩ রামাযান	১৫ এপ্রিল	শুক্রবার	৪ : ১৯	৬ : ২০
১৪ রামাযান	১৬ এপ্রিল	শনিবার	৪ : ১৮	৬ : ২১
১৫ রামাযান	১৭ এপ্রিল	রবিবার	৪ : ১৭	৬ : ২১
১৬ রামাযান	১৮ এপ্রিল	সোমবার	৪ : ১৬	৬ : ২১
১৭ রামাযান	১৯ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪ : ১৫	৬ : ২২
১৮ রামাযান	২০ এপ্রিল	বুধবার	৪ : ১৪	৬ : ২২
১৯ রামাযান	২১ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	৪ : ১৩	৬ : ২২
২০ রামাযান	২২ এপ্রিল	শুক্রবার	৪ : ১২	৬ : ২৩
২১ রামাযান	২৩ এপ্রিল	শনিবার	৪ : ১১	৬ : ২৩
২২ রামাযান	২৪ এপ্রিল	রবিবার	৪ : ১০	৬ : ২৪
২৩ রামাযান	২৫ এপ্রিল	সোমবার	৪ : ০৯	৬ : ২৫
২৪ রামাযান	২৬ এপ্রিল	মঙ্গলবার	৪ : ০৮	৬ : ২৫
২৫ রামাযান	২৭ এপ্রিল	বুধবার	৪ : ০৭	৬ : ২৬
২৬ রামাযান	২৮ এপ্রিল	বৃহস্পতিবার	৪ : ০৬	৬ : ২৬
২৭ রামাযান	২৯ এপ্রিল	শুক্রবার	৪ : ০৫	৬ : ২৬
২৮ রামাযান	৩০ এপ্রিল	শনিবার	৪ : ০৪	৬ : ২৭
২৯ রামাযান	০১ মে	রবিবার	৪ : ০৩	৬ : ২৭
৩০ রামাযান	০২ মে	সোমবার	৪ : ০৩	৬ : ২৭

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিভাগের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সাথে অন্যান্য জেলাসমূহের পার্থক্য মাসে একাধিকবার পরিবর্তন হয়। সেকারণে অধিকতর সঠিক সময় নির্ধারণের লক্ষ্যে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে ইফতারের সময়সূচি দেখানো হয়েছে। জেলাভিত্তিক সময়সূচি

[ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
নরসিংদী	-১	-১	-১	-১
গাজীপুর	০	০	০	০
শরিয়তপুর	+১	০	-১	-১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	-১	-১
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩	+৩
কিশোরগঞ্জ	-২	-১	-১	-১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	-১	-১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	০	০
গোপালগঞ্জ	+৪	+২	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+২	+২	+২

চট্টগাম বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
কুমিল্লা	-২	-৪	-৪	-৪
ফেনী	-৩	-৫	-৫	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৫	-৮	-৯	-৯
নোয়াখালী	-১	-৪	-৪	-৪
চাঁদপুর	০	-২	-২	-২
লক্ষ্মীপুর	০	-২	-৩	-৩
চট্টগ্রাম	-৩	-৭	-৭	-৮
কক্সবাজার	-২	-৮	-৯	-১০
খাগড়াছড়ি	-৫	-৭	-৭	-৮
বান্দরবান	-৫	-৮	-৯	-৯

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিলেট	-৯	-৫	-৫	-৫
মৌলভীবাজার	-৬	-৫	-৫	-৫
হবিগঞ্জ	-৫	-৪	-৪	-৩
সুনামগঞ্জ	-৬	-৩	-৩	-২

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
শেরপুর	০	+২	+৩	+৩
ময়মনসিংহ	-২	+১	+১	+১
জামালপুর	০	+৩	+৩	+৩
নেত্রকোণা	-৩	-১	-১	০

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৪
পাবনা	+৪	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৬
রাজশাহী	+৬	+৭	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৬	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৬	+৭	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৯	+৯	+১০
নওগাঁ	+৪	+৭	+৭	+৭

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
যশোর	+৬	+৫	+৪	+৪
সাতক্ষীরা	+৭	+৫	+৪	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৫	+৩	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৫	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৫	+৩	+৩	+২
বাগেরহাট	+৫	+২	+১	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
পঞ্চগড়	+৩	+৯	+১০	+১১
দিনাজপুর	+৪	+৮	+৯	+৯
লালমনিরহাট	০	+৫	+৬	+৭
নীলফামারী	+৩	+৭	+৮	+৯
গাইবান্ধা	+১	+৪	+৫	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৪	+৯	+১০	+১১
রংপুর	+১	+৬	+৭	+৭
কুড়িগ্রাম	০	+৪	+৫	+৬

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	সাহারী	ইফতার		
		১-১০	১১-২০	২১-৩০
ঝালকাঠি	+৩	০	০	-১
পটুয়াখালী	+৩	-১	-১	-২
পিরোজপুর	+৩	+১	+১	০
বরিশাল	+২	-১	-১	-১
ভোলা	+১	-২	-২	-৩
বরগুনা	+৪	০	-১	-১

সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে বিলম্বে নয় : সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে; ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে। (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৯৮)।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

বি.দ্র. রামাযানের শুরু এবং শেষ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল